হলুদ পোড়া

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কমলা পাবলিশিং হাউস
৮।১এ, হরি পাল লেন,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২

দুই টাকা

শ্রীসত্যচরণ দাস কর্তৃক ৮।এ, হরি পাল লেনস্থ আলেকজান্দ্রা প্রিণ্টিং
ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও ৮।১এ, হরি পাল লেন হইতে প্রকাশিত

হলুদ পোড়া

হলুদ পোড়া

সে বছর কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি তিন দিন আগে পরে গাঁয়ে দু'দুটো খুন হয়ে গেল। একজন মাঝ বয়সী যোয়ান মদ্দ পুরুষ এবং ষোল সতের বছরের একটি রোগা ভীরু মেয়ে।

গাঁয়ের দক্ষিণে ঘোষেদের মজা পুকুরের ধারে একটা মরা গজারি গাছ বহুকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানটি ফাঁকা, বনজঙ্গলের আবরু নেই। কাছাকাছি শুধু কয়েকটা কলাগাছ। ওই গজারি গাছটার নীচে একদিন বলাই চক্রবর্ত্তীকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মাথাটা আটচির হয়ে ফেটে গেছে, খুব সম্ভব অনেকগুলি লাঠির আঘাতে।

চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল বটে কিন্তু লোকে খুব বিস্মিত হল না। বলাই চক্রবর্ত্তীর এই রকম অপমৃত্যুই আশেপাশের দশটা গাঁয়ের লোক প্রত্যাশা করেছিল, অনেকে কামনাও করছিল। অন্যপক্ষে শুভ্রা মেয়েটির খুন হওয়া নিয়ে হৈ চৈ হল কম কিন্তু মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রইল না। গেরস্ত ঘরের সাধারণ ঘরোয়া মেয়ে, গাঁয়ের লোকের চোখের সামনে আর দশটি মেয়ের মত বড় হয়েছে, বিয়ের পর শ্বশুর বাড়ী গেছে এবং মাসখানেক আগে যথারীতি বাপের বাড়ী ফিরে এসেছে ছেলে বিয়োবার জন্য। পাশের বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত কোনদিন কল্পনা করার ছুতো পায়নি যে মেয়েটার জীবনে খাপছাড়া কিছু লুকানো ছিল, এমন

ভয়াবহ পরিণামের নাটকীয় উপাদান সঞ্চিত হয়েছিল! গাঁয়ে সব শেষের সাঁঝের বাতিটি বোধ হয় যখন সবে জ্বালা হয়েছে তখন বাড়ীর পিছনে ডোবার ঘাটে শুভ্রার মত মেয়েকে কে বা কারা যে কেন গলা টিপে মেরে রেখে যাবে ভেবে উঠতে না পেরে গাঁ শুদ্ধ লোক যেন অপ্রস্তুত হয়ে রইল।

বছর দেড়েক মেয়েটা শ্বশুর বাড়ী ছিল, গাঁয়ের লোকের চোখের আড়ালে। সেখানে কি এই ভয়ানক অঘটনের ভূমিকা গড়ে উঠেছিল?

দুটো খুনের মধ্যে কি কোন যোগাযোগ আছে? বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে গাঁয়ের কেউ তেমন ভাবে জখম পর্য্যন্ত হয়নি, যখন হল পর পর একেবারে খুন হয়ে গেল দুটো! তার একটি পুরুষ, অপরটি যুবতী নারী। দুটি খুনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করার জন্য প্রাণ সকলের ছটফট করে। কিন্তু বলাই চক্রবর্ত্তী শুভ্রাকে কবে শুধু চোখের দেখা দেখেছিল তাও গাঁয়ের কেউ মনে করতে পারে না। একটুখানি বাস্তব সত্যের খাদের অভাবে নানা জনের কল্পনা ও অনুমানগুলি গুজব হয়ে উঠতে উঠতে মুষড়ে যায়।

বলাই চক্রবর্ত্তীর সম্পত্তি পেল তার ভাইপো নবীন। চল্লিশ টাকার চাকরী ছেড়ে সহর থেকে সপরিবারে গাঁয়ে এসে ক্রমাগত কোঁচার খুঁটে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে সে পাড়ার লোককে বলতে লাগল, 'পঞ্চাশ টাকা রিওয়ার্ড ঘোষণা করেছি। কাকাকে যারা অমন মার মেরেছে তাদের যদি ফাঁসি কাঠে ঝুলোতে না পারি—'

চশমার কাঁচের বদলে মাঝে মাঝে কোঁচার খুঁটে সে নিজের চোখও মুছতে লাগল।

ঠিক একুশ দিন গাঁয়ে বাস করার পর নবীনের স্ত্রী দামিনী সন্ধ্যাবেলা লণ্ঠন হাতে রান্নাঘর থেকে উঠান পার হয়ে শোবার ঘরে যাচ্ছে, কোথা থেকে অতি মৃদু একটু দমকা বাতাস বাড়ীর পুব কোণের তেঁতুল

গাছের পাতাকে নাড়া দিয়ে তার গায়ে এসে লাগল। দামিনীর হাতের লণ্ঠন ছিটকে গিয়ে পড়ল দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায়, উঠানে আছড়ে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে দামিনীর দাঁতে দাঁত লেগে গেল। দালানের আনাচে কানাচে ঝড়ো হাওয়া যেমন গুমরে গুমরে কাঁদে, দামিনী আওয়াজ করতে লাগল সেই রকম।

শুভ্রার দাদা ধীরেন স্থানীয় স্কুলে মাষ্টারী করে। গাঁয়ে সেই একমাত্র ডাক্তার-পাশ-না-করা। ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পাশ করে সাত বছর গাঁয়ের স্কুলে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছে। প্রথম দিকে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সাতচল্লিশখানা বই নিয়ে লাইব্রেরী, সাতজন ছেলেকে নিয়ে তরুণ সমিতি, বই পড়ে পড়ে সাধারণ যোগে বিনামূল্যে ডাক্তার, এইসব আরম্ভ করেছিল। গেঁয়ো একটি মেয়েকে বিয়ে করে দু'বছরে চারটি ছেলে-মেয়ের জন্ম হওয়ায় এখন অনেকটা ঝিমিয়ে গেছে। লাইব্রেরীর বইএর সংখ্যা তিনশ'তে উঠে থেমে গেছে, তার নিজের সম্পত্তি হিসাবে বইয়ের আলমারি তার বাড়ীতেই তালাবন্ধ হয়ে থাকে, চাঁদা কেউ দেয় না, তবে দু'চারজন পড়া-বই আর একবার পড়ার জন্য মাঝে মাঝে চেয়ে নিয়ে যায়। বছরে দু'তিনবার তরুণ-সমিতির মিটিং হয়। চার আনা আট আনা ফি নিয়ে এখন সে ডাক্তারি করে, ওষুধও বিক্রী করে।

ধীরেনকে যখন ডেকে আনা হল, কলসী কলসী জল ঢেলে দামিনীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু সে তাকাচ্ছে অর্থহীন দৃষ্টিতে, আপন মনে হাসছে আর কাঁদছে এবং যারা তাকে ধরে রেখেছিল তাদের আঁচড়ে কামড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

ধীরেন গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলল, 'শা'পুরের কৈলাস ডাক্তারকে একবার ডাকা দরকার। আমি চিকিৎসা করতে পারি, তবে কি জানেন, আমি তো পাশ করা ডাক্তার নই, দায়িত্ব নিতে ভরসা হচ্ছে না।

বুড়ো পঙ্কজ ঘোষাল বলাই চক্রবর্ত্তীর অনুগ্রহে বহুকাল সপরিবারে পরিপুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি বললেন, 'ডাক্তার? ডাক্তার কি হবে? তুমি আমার কথা শোন বাবা নবীন, কুঞ্জকে অবিলম্বে ডেকে পাঠাও।'

গাঁয়ের যারা ভিড় করেছিল তারা প্রায় সকলেই বুড়ো ঘোষালের কথায় সায় দিল।

নবীন জিজ্ঞেস করল, 'কুঞ্জ কত নেয়?'

ধীরেন বলল, 'ছি, ওসব দুর্ব্বুদ্ধি কোরো না নবীন। আমি বলছি তোমায়, এটা অসুখ, অন্য কিছু নয়। লেখা পড়া শিখেছ, জ্ঞান বুদ্ধি আছে, তুমিও কি বলে কুঞ্জকে চিকিৎসার জন্য ডেকে পাঠাবে?'

নবীন আমতা আমতা করে বলল, 'এসব খাপছাড়া অসুখে ওদের চিকিৎসাই ভাল ফল দেয় ভাই।'

বয়সে নবীন তিনচার বছরের বড় কিন্তু এককালে দু'জনে একসঙ্গে স্কুলে একই ক্লাসে পাশাপাশি বসে লেখাপড়া করত। বোধ হয় সেই খাতিরেই কৈলাশ ডাক্তার ও কুঞ্জ মাঝি দু'জনকে আনতেই নবীন লোক পাঠিয়ে দিল।

কুঞ্জই আগে এল। লোক পৌঁছবার আগেই সে খবর পেয়েছিল চক্রবর্ত্তীদের বৌকে অন্ধকারের অশরীরী শক্তি আয়ত্ত করেছে। কুঞ্জ নামকরা গুণী। তার গুণপনা দেখবার লোভে আরও অনেকে এসে ভিড় বাড়িয়ে দিল।

'ভর সাঁঝে ভর করেছেন, সহজে ছাড়বেন না।'

ওই বলে সকলকে ভয় দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার অভয় দিয়ে কুঞ্জ বলল, 'তবে ছাড়তে হবেই শেষ তক্। কুঞ্জ মাঝির সাথে তো চালাকি চলবে না।'

ঘরের দাওয়া থেকে সকলকে উঠানে নামিয়ে দেওয়া হল। বিড়

বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে কুঞ্জ দাওয়ায় জল ছিটিয়ে দিল। দামিনীর এলো চুল শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল দাওয়ার একটা খুঁটির সঙ্গে, দামিনীর না রইল বসবার উপায়, না রইল পালাবার ক্ষমতা। তাকে আর কারো ধরে রাখবার প্রয়োজন রইল না। নড়তে গিয়ে চুলে টান লাগায় দামিনী আর্ত্তনাদ করে উঠতে লাগল।

কুঞ্জ টিটকারী দিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'রও, বাছাধন রও। এখনি হয়েছে কি! মজাটি টের পাওয়াচ্ছি তোমায়!'

ধীরেন প্রথম দিকে চুপ করে ছিল। বাধা দিয়ে লাভ নেই। গাঁয়ের লোক কথা শোনে না, বিরক্ত হয়। এবার সে আর ধৈর্য্য ধরতে পারল না।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, নবীন?'

'তুমি চুপ কর, ভাই।'

উঠানে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন পুরুষ ও নারী এবং গোটা পাঁচেক লণ্ঠন জড়ো হয়েছে। মেয়েদের সংখ্যা খুব কম, যারা এসেছে বয়সও তাদের বেশী। কম বয়সী মেয়েরা আসতে সাহস পায় নি, অনুমতিও পায় নি। যদি ছোঁয়াচ লাগে, নজর লাগে, অপরাধ হয়! মন্ত্রমুগ্ধের মত এতগুলি মেয়েপুরুষ দাওয়ার দিকে তাকিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকে, এই দুর্লভ রোমাঞ্চ থেকে তাদের বঞ্চিত করার ক্ষমতা নবীনের নেই। দাওয়াটি যেন ষ্টেজ, সেখানে যেন মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত রহস্যকে সহজবোধ্য নাটকের রূপ দিয়ে অভিনয় করা হচ্ছে, ঘরের দুয়ারে কুঞ্জ যেন আমদানী করেছে জীবনের শেষ সীমানার ওপারের ম্যাজিক। এমন ঘরোয়া, এমন বাস্তব হয়ে উঠেছে দামিনীর মধ্যে অদেহী ভয়ঙ্করের এই ঘনিষ্ঠ আবির্ভাব! ভয় সকলে ভুলে গেছে। শুধু আছে তীব্র উত্তেজনা এবং কৌতূহল ভরা পরম উপভোগ্য শিহরণ।

এক পা সামনে এগিয়ে, পাশে সরে, পিছু হটে, সামনে পিছনে দুলে দুলে কুঞ্জ দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়াতে থাকে। মালসাতে আগুন করে তাতে সে একটি দুটি শুকনো পাতা আর শিকড় পুড়তে দেয়, চামড়া পোড়ার মত একটা উৎকট গন্ধে চারিদিক ভরে যায়। দামিনীর আর্তনাদ ও ছটফটানি ধীরে ধীরে কমে আসছিল, এক সময়ে খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সে বোঁজ' বোঁজ' চোখে কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হয়ে রইল।

তখন একটা কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে কুঞ্জ তার নাকের কাছে ধরল। দামিনীর ঢুলু ঢুলু চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সর্ব্বাঙ্গে ঘন ঘন শিহরণ বয়ে যেতে লাগল।

'কে তুই? বল, তুই কে?'

'আমি শুভ্রা গো, শুভ্রা। আমায় মেরো না।

'চাটুয্যে বাড়ীর শুভ্রা? যে খুন হয়েছে?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমায় মেরো না।'

নবীন দাওয়ার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তার দিকে মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জ বলল, 'ব্যাপার বুঝলেন কর্ত্তা?'

উঠান থেকে চাপা গলায় বুড়ো ঘোষালের নির্দ্দেশ এল, 'কে খুন করেছিল শুধোও না কুঞ্জ? ওহে কুঞ্জ, শুনছো? কে শুভ্রাকে খুন করেছিল শুধিয়ে নাও চট্ করে।'

কুঞ্জকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না, দামিনী নিজে থেকেই ফিস ফিস করে জানিয়ে দিল, 'বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।'

নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার তাকে প্রশ্ন করা হল কিন্তু দামিনীর মুখ দিয়ে এ ছাড়া আর কোন জবাব বার হল না যে সে শুভ্রা এবং বলাই তাকে খুন করেছে। তারপর একসময় তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল,

নাকে হলুদপোড়া ধরেও আর তাকে কথা বলানো গেল না। কুঞ্জ অন্য একটি প্রক্রিয়ার আয়োজন করছিল কিন্তু কৈলাস ডাক্তার এসে পড়ায় আর সুযোগ পেল না। কৈলাশের চেহারাটি জমকালো, প্রকাণ্ড শরীর, একমাথা কাঁচাপাকা চুল, মোটা ভুরু আর মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। এসে দাঁড়িয়েই ষাঁড়ের মত গর্জ্জন করতে করতে সে সকলকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করল, কুঞ্জর আগুনের মালসা তার দিকেই লাথি মেরে ছুড়ে দিয়ে বলল, 'দাঁড়া হারামজাদা, তোকে ফাঁসি কাঠে ঝুলোচ্ছি। ওষুদ দিয়ে বৌমাকে আজ মেরে ফেলে থানায় তোর নামে রিপোর্ট দেব, তুই খুন করেছিস।'

কৈলাস খুঁটিতে বাঁধা চুল খুলে দামিনীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বলাই-এর দাদামশায়ের আমলের প্রকাণ্ড খাটের বিছানায় শুইয়ে দিল। প্যাট করে তার বাহুতে ছুঁচ ফুটিয়ে গায়ে ঢুকিয়ে দিল ঘুমের ওষুধ।

দামিনী কাতরভাবে বলল, 'আমায় মেরো না গো, মেরো না। আমি শুভ্রা। চাটুয্যে বাড়ীর শুভ্রা।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

দামিনীর মুখ দিয়ে শুভ্রা বলাই চক্রবর্ত্তীর নাম করায় অনেক বিশ্বাসীর মনে যে ধাঁধাঁর সৃষ্টি হয়েছিল, বুড়ো ঘোষালের ব্যাখ্যা শুনে সেটা কেটে গেল। শুভ্রার তিন দিন আগে বলাই চক্রবর্ত্তী মরে গিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু শুধু জ্যান্ত মানুষ কি মানুষের গলা টিপে মারে? আর কিছু মারে না? শ্মশানে মশানে দিনক্ষণ প্রভৃতির যোগাযোগ ঘটলে পথভোলা পথিকের ঘাড় তবে মাঝে মাঝে মটকে দেয় কিসে!

ব্যাখ্যাটা দেওয়া উচিত ছিল কুঞ্জ গুণীর। বুড়ো ঘোষাল আগেই সকলকে শুনিয়ে দেওয়াতে জোর গলায় তাকে সমর্থন করেই নিজের মর্য্যাদা বাঁচানো ছাড়া তার উপায় রইল না। তবে কথাটাকে সে ঘুরিয়ে

দিল একটু অন্যভাবে, যার ফলে অবিশ্বাসীর মনে পর্য্যন্ত খটকা বাঁধা সম্ভব হয়ে উঠল। বলাই চক্রবর্ত্তীই শুভ্রাকে খুন করেছে বটে কিন্তু সোজাসুজি নিজে নয়। কারণ, মরার এক বছরের মধ্যে সেটা কেউ পারে না, ওই সময়ের মধ্যে শ্রাদ্ধ-শান্তি না হলে তবেই সোজাসুজি মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা জন্মায়। বলাই চক্রবর্ত্তী একজনকে ভর করে তার মধ্যস্থতায় শুভ্রাকে খুন করেছে, তার রক্তমাংসের হাত দিয়ে।

না, যাকে সে ভর করেছিল তার কিছু মনে নেই। মনে কি থাকে!

এক রাত্রে অনেক কাণ ঘুরে পরদিন সকালে এই কথাগুলি ধীরেনের কাণে গেল। অগ্রহায়ণের উজ্জ্বল মিঠে রোদ তখন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, বর্ষার পরিপুষ্ট গাছে আর আগাছার জঙ্গলে যেন পার্থিব জীবনের ছড়াছড়ি। বাড়ীর পিছনে ডোবাটি কচুরীপানায় আচ্ছন্ন, গাঢ় সবুজ অসংখ্য রসালো পাতা, বর্ণনাতীত কোমল রঙের অপরূপ ফুল। তাল-গাছের গুঁড়ির ঘাটটি কার্ত্তিক মাসেও প্রায় জলে ডুবে ছিল, এখন জল কমে অর্দ্ধেকের বেশী ভেসে উঠেছে। টুকরো বসিয়ে ধাপগুলি এবার ধীরেন বিশেষ করে শুভ্রার জন্য বানিয়ে দিয়েছিল, সাত মাসের গর্ভ নিয়ে ঘাটে উঠতে নামতে সে যাতে পা পিছলে আছাড় না খায়। পাড়ার মানুষ বাড়ী বয়ে গাঁয়ের গুজব শুনিয়ে গেল, আবেষ্টনীর প্রভাবে উদ্ভট কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে ধীরেনের মন থেকে বাতিল হয়ে গেল। ক্ষুব্ধ হবার অবসরও সে পেল না। ডোবার কোনদিক থেকে কি ভাবে কে সেদিন সন্ধ্যায় ঘাটে এসেছিল, কেন এসেছিল, এই পুরোণো ভাবনা সে ভাবছিল অনেকক্ষণ থেকে। তাই সে ভাবতে লাগল। একমাত্র এই ভাবনা তাকে অন্যমনস্ক করে দেয়। ক্ষোভ ও বিষাদের তার এত প্রাচুর্য্য এখন যে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হতে না পারলে তার অসহ্য কষ্ট হয়। অন্য কোন বিষয়ে তার মন বসে না।

ভাতের থালা সামনে ধরে দিয়ে শান্তি বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয় তাই হবে। নইলে—'

কটমট করে তাকিয়ে ধীরেন ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ্। যা খুসী মনে হোক তোমার, আমায় কিছু বলবে না। খপর্দ্দার।'

স্কুলে যাওয়ার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হল মুখে তারা কিছু বলল না কিন্তু তাদের তাকানোর ভঙ্গি যেন আরও স্পষ্ট জিজ্ঞাসা হয়ে উঠল : কথাটা তুমি কি ভাবে নিয়েছ শুনি? পুরুতঠাকুর তাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে দোষমোচনের জন্য দরকারী ক্রিয়াকর্ম্মের বিষয় আলোচনা করলেন, উপদেশ দিলেন, বিশেষ করে বলে দিলেন যে স্কুল থেকে ফিরবার সময় তার বাড়ী থেকে সে যেন তার নিজের ও বাড়ীর সকলের ধারণের জন্য মাদুলী নিয়ে যায়। স্কুলে পা দেওয়ার পর থেকে ধীরেনের মনে হতে লাগল, সে যেন বাইরের কোন বিশিষ্ট অভ্যাগত স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছে, তার সাত বছরের অভ্যস্ত অস্তিত্বকে আজ এক মুহূর্ত্তের জন্য কেউ ভুলতে পারছে না।

প্রথম ঘণ্টাতেই ক্লাশ ছিল। অর্দ্ধেক ছেলে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, বাকী অর্দ্ধেক নিজেদের মধ্যে গুজগাজ ফিসফিস করছে। নিজেকে জীবন্ত ব্যাঙের মত মনে হচ্ছিল। বইয়ের পাতায় চোখ রেখে ধীরেন পড়াতে লাগল। চোখ তুলে ছেলেদের দিকে তাকাতে পারল না।

ঘণ্টা কাবার হতেই হেডমাষ্টার ডেকে পাঠালেন।

'তুমি একমাসের ছুটি নাও ধীরেন।'

'এক মাসের ছুটি?'

'মথুরবাবু এইমাত্র বলে গেলেন। আজ থেকেই ছুটি পাবে, আজ আর তোমার পড়িয়ে কাজ নেই।'

মথুরবাবু স্কুলের সেক্রেটারী। মাইল খানেক পথ হাঁটলেই তার

বাড়ী পাওয়া যায়। চলতে চলতে মাঝপথে ধীরেনের মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। কদিন থেকে হঠাৎ চেতনায় ঝাঁকি লেগে মাথাটা তার এই রকম ঘুরে উঠছে। চিন্তা ও অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই ঝাঁকি লাগে; অথবা এমনি ঝাঁকি লেগে তার চিন্তা ও অনুভূতি বদলে যায়।

গাছতলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সে বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। মথুরবাবু এখন হয়তো খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করছেন, এখন তাঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি, একমাসের ছুটি দেওয়া হয়েছে। এক মাসের মধ্যে মথুরবাবুর সঙ্গে দেখা করার অনেক সময় সে পাবে। আজ গিয়ে হাতে পায়ে না ধরাই ভাল। মথুরবাবু যদি দয়া হয়, যদি তিনি বুঝতে পারেন যে তার বোন খুন হয়েছে বলে, যামিনীর ঘোষণার ফলে তার বোনের কাল্পনিক কেলেঙ্কারি নিয়ে চারিদিকে হৈ চৈ হচ্ছে বলে তাকে দোষী করা উচিত নয়, তা হলে মুস্কিল হতে পারে। ছুটি বাতিল করে কাল থেকে কাজে যাবার অনুমতি হয়তো তিনি দিয়ে বসবেন। এতক্ষণ খেয়াল হয়নি, এখন সে বুঝতে পেরেছে, নিয়মিতভাবে প্রতিদিন স্কুলে ছেলেদের পড়ানোর ক্ষমতা তার নেই। মথুরবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা হচ্ছে। চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে সে মাঠের পথ ধরে বাড়ী চলেছে। বাড়ী গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকোতে হবে। দুর্ব্বল শরীরটা বিছানায় লুটিয়ে দিয়ে ভারি মাথাটা বালিশে রাখতে হবে।

সারা দুপুর ঘরের মধ্যে শুয়ে বসে ছটফট করে কাটিয়ে শেষবেলায় ধীরেন উঠানে বেরিয়ে এল। মাজা বাসন হাতে নিয়ে শান্তি ঘাট থেকে উঠে আসছিল। ডোবার ধারে প্রকাণ্ড বাঁশ ঝাড়টার ছায়ায় মানুষের মত কি যেন একটা নাড়াচাড়া করছে।

ধীরেন আর্ত্তনাদ করে উঠল, 'কে ওখানে? কে?'

শান্তির হাতের বাসন ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল। উটপড়ি' করে কাছে ছুটে এসে ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় কে? কোনখানে?'

বাঁশ ঝাড় থেকে চেনা গলার আওয়াজ এল।—'আমি মাষ্টারবাবু। বাঁশ কাটছি।'

'কে তোকে বাঁশ কাটতে বলেছে?'

শান্তি বলল, 'আমি বলেছি। ক্ষেন্তি পিসী বলল, নূতন একটা বাঁশ কেটে আগা মাথা একটু পুড়িয়ে ঘাটের পথে তাড়াতাড়ি ফেলে রাখতে। ভোরে উঠে সরিয়ে দেব, সন্ধের আগে পেতে রাখব। তুমি যেন আবার ভুল করে বাঁশটা ডিঙ্গিয়ে যেও না।'

সন্ধ্যার আগেই শান্তি আজকাল রাঁধা বাড়া আর ঘরকন্নার সব কাজ শেষ করে রাখে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর ধীরেনকে সঙ্গে না নিয়ে বড় ঘরের চৌকাট পার হয় না। ছেলেমেয়েদেরও ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। সন্ধ্যা থেকে ঘরে বন্দী হয়ে ধীরেন আকাশ পাতাল ভাবে আর মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে ছেলেমেয়েদের আলাপ শোনে।

'ছোটপিসী ভূত হয়েছে।'

'ভূত নয়, পেত্নী। ব্যাটাছেলে ভূত হয়।'

ঘরের মধ্যেও কারণে অকারণে শান্তি ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠে। কাল প্রথম রাত্রে একটা প্যাঁচার ডাক শুনে ধীরেনকে আঁকড়ে ধরে গোঙাতে গোঙাতে বমি করে ফেলেছিল।

বড় ঘরের দাওয়ার পুব প্রান্তে বসে তামাক টানতে টানতে দিনের আলো ম্লান হলে এল। এখানে বসে ডোবার ঘাট আর দু'ধারের বাঁশ ঝাড় ও জঙ্গল দেখা যায়। জঙ্গলের পর সেনেদের কলাবাগান। সেনেদের কাছারি ঘরের পাশ দিয়ে দূরে ঘোসেদের মজা পুকুরের তীরে মরা গজারি

গাছটার ডগা চোখে পড়ে। অন্ধকার হবার আগেই কুয়াসায় প্রথমে গাছটা তারপর সেনেদের বাড়ী আবছা হয়ে ঢাকা পড়ে গেল।

'তুমি কি আর ঘাটের দিকে যাবে?' শান্তি জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'তবে বাঁশটা পেতে দাও।'

'বাঁশ পাততে হবে না।'

শান্তি কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তোমার চোখ লাল হয়েছে। টকটকে লাল।'

'হোক।'

শোবার ঘর আর রান্নাঘরের ভিটের সঙ্গে দু'টি প্রান্ত ঠেকিয়ে শান্তি নিজেই বাঁশটা পেতে দিল। কাঁচা বাঁশের দু'প্রান্তের খানিকটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অশরীরী কোন কিছু এ বাঁশ ডিঙোতে পারবে না। ঘাট থেকে শুভ্রা যদি বাড়ীর উঠানে আসতে চায়, এই বাঁশ পর্য্যন্ত এসে ঠেকে যাবে।

আলো জ্বালার আগেই ছেলেমেয়েদের খাওয়া শেষ হল। সন্ধ্যাদীপ না জ্বেলে শান্তির নিজের খাওয়ার উপায় নেই, ভাল করে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে তাড়াতাড়ি দীপ জ্বেলে ঘরে ঘরে দেখিয়ে শাখে ফুঁ দিল। দশ মিনিটের মধ্যে নিজে খেয়ে ধীরেনের ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রেখে, রান্না ঘরে তালা দিয়ে, কাপড় ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিকালে আজকাল সে মাছ রান্না করে না, এটোকাঁটা নাকি অশরীরী আত্মাকে আকর্ষণ করে। খাওয়ার হাঙ্গামা খুব সংক্ষেপে, সহজে এবং অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়।

'ঘরে আসবে না?'

'না।'

তখনো আকাশ থেকে আলোর শেষ আভাসটুকু মুছে যায় নি। দু'তিনটি তারা দেখা দিয়েছে, আরও কয়েকটি দেখা দিতে দিতে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। আর এক মিনিট কি দু'মিনিটের মধ্যে রাত্রি সুরু হয়ে যাবে। জীবতের সঙ্গে মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় সন্ধ্যা। ভর সন্ধ্যাবেলা শুভ্রা দামিনীকে আশ্রয় করেছিল। আজ সন্ধ্যা পার হলে রাত্রি আরম্ভ হয়ে গেলে চেষ্টা করেও শুভ্রা হয়তো তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। আর দেরী না করে এখুনি শুভ্রাকে সুযোগ দেওয়া উচিত।

চোরের মত ভিটে থেকে নেমে বাঁশ ডিঙ্গিয়ে ধীরেন পা টিপে টিপে ডোবার মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।

অদ্ভুত বিকৃত গলার ডাক শুনে শান্তি লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাঁশের ওপারে দাঁড়িয়ে হিংস্র জন্তুর চাপাগর্জ্জনের মত গম্ভীর আওয়াজে ধীরেন তার নিজের নাম ধরে ডাকডাকি করছে। গেঞ্জি আর কাপড়ে কাদা ও রক্ত মাখা। ঠোঁট থেকে চিবুক বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

'বাঁশটা সরিয়ে দাও।'

'ডিঙ্গিয়ে এসো। বাঁশ ডিঙ্গিয়ে চলে এসো। কি হয়েছে? পড়ে গেছ নাকি?'

'ডিঙ্গোতে পারছি না। বাঁশ সরিয়ে দাও।'

বাঁশ ডিঙ্গোতে পারছে না! মাটিতে শোয়ানো বাঁশ! শান্তির আর এতটুকু সন্দেহ রইল না। আকাশ চেরা তীক্ষ্ন গলায় সে আর্ত্তনাদের পর আর্ত্তনাদ সুরু করে দিল।

তারপর প্রতিবেশী এল, পাড়ার লোক এল, গাঁয়ের লোক এল। কুঞ্জও এল। তিন চার কলস জল ঢেলে ধীরেনকে স্নান করিয়ে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে ফেলা হল। মন্ত্র পড়ে, জল ছিটিয়ে, মালসার আগুণে পাতা ও শিকড় পুড়িয়ে ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় ধীরেনকে কুঞ্জ নিঝুম করে ফেলল।

তারপর মালসার আগুণে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে বজ্রকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুই? বল তুই কে?'

ধীরেন বলল, 'আমি বলাই চক্রবর্ত্তী। শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।'

বোমা

পৃথিবীর কত জায়গায় কত বোমাই তো ফাটছে, হিসাব রাখা কেবল অসম্ভব নয়,···অন্যায়। তাতে পৃথিবীর অনেক যায়গায় এখনকার মত অসংখ্য বোমা ফাটায় বাধা হতে পারে। বোমার চেয়ে মানুষকে বেশী কাবু করে হিসাব। বোমা ফাটার অতি আন্দাজী অতি বেঠিক হিসাবও হয়ত অনেকগুলি মানুষকে করে দেবে অনেকগুলি জীবন্ত প্রশ্ন : এত বোমা ফাটে কেন ?

জীবন্ত প্রশ্ন জবাব আবিষ্কার করবেই। তার ফলে পৃথিবী জুড়ে হয়ত বোমা ফাটাফাটি সম্বন্ধে এমন কোঁড়া ব্যবস্থাই হবে যে বোমা আর একরকম ফাটবেই না।

আর তার ফলে হয়তো পৃথিবী জুড়ে এমন ভীষণ নিঃশব্দ শান্তি বিরাজ করবে যে গোপালের পর্য্যন্ত মনে হবে আর একবার পৃথিবীটা পাক দিয়ে আসা যাক। ঘরের চেয়ে বাইরের শান্তি বেশী হলে অশান্ত মানুষের কি ঘরের টান থাকে ?

আহা, এত ভাল মানুষ হয়েছে গোপাল, দোতলা একটা বাড়ীতে এত যত্নে সে এমন নিবিড় শান্তিপূর্ণ সংসার পেতেছে, রোজ রাত্রে নীল আলো জ্বালা ঘরে তাকেই বিবসনা করার অধিকার পেয়েছে, যার জন্ত একবার পৃথিবীটাই সে পাক দিয়ে এসেছিল, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে বোমার

কাটাকাটিতে উড়ে যেতে হলেও কি আর তাকে ঘর ছাড়া করা উচিত ?

এই ধরণের ভাবনাই সুধা ভাবে,—সম্পূর্ণ অন্য ভাবে। সে এমন ভীরু আর চালাক মেয়ে যে আরও কয়েকটা বছর গোপালের দিনান্তের কর্ম্মাক্লান্তিক অবসাদের সঙ্গে ঘরের আবহাওয়ার সামঞ্জস্য সে বজায় রাখবেই। এখনও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা সে পছন্দ করে না। এখনও হিষ্টিরিয়াকে সে ঘেন্না করে। কারণ সুধার স্নায়ু এখনও বড় দুর্ব্বল। মাঝে মাঝে এখনও তার হিষ্টিরিয়া হয়। কিন্তু স্নায়ু তো একদিন সবল হবে ? হিষ্টিরিয়া তো একদিন সেরে যাবে ? নিজমূর্ত্তি ধারণ করলে কি বিপদটাই না জানি তখন তার হবে।

পৃথিবীর আর কোন জীবন্ত প্রাণী বাঁচুক মরুক কিছুই তার এসে যায় না এমনভাবে সুধাকে গোপাল ভালবাসে, রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি থেকে আরম্ভ করে নৈতিকনীতি পর্য্যন্ত চুলোয় পাঠান যায় এমনভাবে গোপাল সুধাকে ভালভাসে। তবু সুধার ভয় আর চালাকির শেষ নেই। আবার যদি গোপাল পৃথিবী পাক দিতে চলে যায় ? কিছুতেই মুখ ফুটে বিয়ের কথাটা বলছিল না বলে কথাটা বলবার জন্য একজনের কাছে আত্মসমর্পণের ভাণ করায় কুমারী অবস্থায় তাকে ত্যাগ করে সাত বছরের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে আর ভাণটা কার্য্যে পরিণত করা সত্ত্বেও সাত বছর পরে ফিরে এসে সেই আর একজনের বিধবা অবস্থায় পেয়েও তাকে বিনা বাক্যব্যয়ে যে বিয়ে করে ফেলতে পারে, তাকে বিশ্বাস নেই। সে সব পারে। একা সে তাকে বেশী দিন বেঁধে রাখতে পারবে না। সেজন্য ছেলে মেয়ে চাই।

যে দুটি ছেলে তার আছে তারা নয়। গোপালের নিজের ছেলে মেয়ে।

ছেলে সুধার হল,—পর পর তিনটি। স্নায়বিক দুর্ব্বলতাও সুধার

কমে গেল, হিষ্টিরিয়াও বিদায় হল। কিন্তু দুই আর তিনে যে পাঁচ হয় এই হিসাবটাই তাকে করে রেখে দিল কাবু। পর পর পাঁচ ছেলে কোলে পাওয়া যে কোন মেয়েমানুষের পক্ষে সাংঘাতিক ব্যাপার,—অদ্ভুত অকথ্য রহস্য। মেয়ে কই? কেন মেয়ে হয় না তার? গোপাল ছাড়া এ জগতে কার কাছে কবে সে কি অপরাধ করেছে যে তার মেয়ে হয় না,—হয়ত হবে না?

এবারও যদি ছেলে হয়?

টের পাওয়ার একমাসের মধ্যে সুধা দুর্ভাবনায় শুকিয়ে গেল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, অসুখ নয়, অন্য কিছু, এরকম হয়, ভাবনার কিছু নেই, টনিক খেলেই ঠিক হয়ে যাবে, চেঞ্জের ব্যবস্থা করতে পারলে—

সুধা রাগ করে বললে, 'চেঞ্জ না হাতী। ছুটি তো তোমার একদিনও পাওনা নেই, কার সঙ্গে যাব?'

'তোমার দাদার সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, তোমাকে ফেলে রেখে দাদার সঙ্গে চেঞ্জে যাব—অত সঁখে আমার কাজ নেই।'

পাঁচবার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, পাঁচবার ছেলে হয়েছে। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার জন্য এবার যদি মেয়ে হওয়ার সম্ভাবনাটা একটু বাড়ে, স্বাস্থ্য ভাল করার চেষ্টা করাটা কি উচিত হবে? সুধা টনিকও খেল না, চেঞ্জেও গেল না, খারাপ শরীর খারাপ করেই রেখে দিল। এমন কি, বেশীরকম চুল উঠে যেতে আরম্ভ করায় চুলের সঙ্গে জীবনটাই যেন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে মনে হতে লাগল বটে তবু চুলের জন্য পর্য্যন্ত টনিকের ব্যবস্থা করল না।

ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে গোপালকে জিজ্ঞাসা করল, 'এবারও যদি ছেলে হয়?'

গোপাল উদাসভাবে বলল, 'হলে হবে।'

খানিকটা ঝিমিয়ে সুধা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা এমন কি কোন উপায় নেই, যাতে লোক ছেলে চাইলে ছেলে পায়, মেয়ে চাইলে মেয়ে?'

গোপাল হঠাৎ সচেতন হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা কি শুনি? তোমার হয়েছে কি?'

সুধা রেগে বলল, 'ব্যাপার পরে শুনো, আগে যা বললাম তার জবাবটা দিয়ে নাও।'

জবাব গোপাল কি দেবে? এ তো জীবন্ত প্রশ্ন নয় যে মানুষ প্রশ্ন করতে শিখবার পর অনেককাল কেটে গিয়েছে বলেই জবাব একটা আবিষ্কৃত হয়ে থাকবে,—জীবনের এ একটা সাধারণ প্রশ্ন, সাধারণ কৌতূহল। গোপাল তাই চিরন্তন যুক্তি দেখিয়ে বলল, 'হয়তো উপায় আছে, মানুষ তা জানে না।'

মানুষ কেন জানেনা এরকম কুটীল প্রশ্ন করার মত জটিল মনোবিকার সুধার জন্মে নি, সে তাই বিনা প্রতিবাদে প্রতিদিন রোগা হয়ে যেতে আরম্ভ করল। রোগা হতে হতে মাস দেড়েকের মধ্যে এমন রোগাই হয়ে গেল যে জন্মাবার আগেই মেয়েটি তার গেল মরে।

সুধা কেঁদেই অস্থির। হায়, মেয়ে মেয়ে করে পাগল হয়ে মেয়েকেই সে হারিয়ে বসল! মাথা খারাপ না হলে মেয়ে কিনা জানার আগে মেয়ে নয় মনে করে মানুষ এমন ব্যাকুল হয়? কদিন খুব কাঁদাকাটা করে সুধার মন শান্ত হবার আর স্নায়ু অবসন্ন হবার সুযোগ পেল। তার ফলে ধীরে ধীরে এল স্থায়ী বিষাদ, যা অনেকটা পরিতৃপ্তির সামিল।

পরের বার একটি মেয়ে হল সুধার। অনেকদিন পরে—প্রায় চারবছর।

এইখানে উনিশ বছরের ছেদ দেবার সুযোগে সুধার মেয়ে হওয়ার সঙ্গে পৃথিবীর বোমা ফাটাফাটি সম্পর্কটা সংক্ষেপে একটু ব্যাখ্যা করি। এটা অবশ্য একটা চরম দৃষ্টান্ত কিন্তু সেজন্যে কিছু এসে যায় না। দুয়ে আর দুয়ে যে যুক্তিতে চার হয় দু'লাখে আর দু'লাখে সেই যুক্তিতেই হয় চারলাখ। তুলনামুলকতার ঘোরপ্যাঁচ ছাড়া এর মধ্যে আর কোন বিস্ময়কর অসত্য নেই,—অতি সহজ কথা। এ যুগের চরম আর পরিণত দৃষ্টান্ত হিসাবে না ধরে সুধাকে ছেঁটে কেটে যদি সেযুগের মৌলিক আর অপরিণত দৃষ্টান্তে দাঁড় করান হয়, তবু দেখা যাবে এই সুধার এভাবে মেয়ে হওয়ার মত সেই সুধার অতি সামান্য রকম এভাবে মেয়ে হওয়ার জন্যই মানুষের দাঁত আর নখে বোমার রক্ত পিপাসা জেগেছিল। নখের আঁচড় আর বোমার বিস্ফোরণের মধ্যে যে পার্থক্য নেই, এই ধারণা পোষণ করাই প্রত্যেকের উচিত। তা না হলে তুলনামূলক ঘোরপ্যাঁচের ফাঁদে পড়ে মানুষ তর্ক আর হাতাহাতি করে,—কোন সময় নখ দিয়ে আচড়ায় আর দাঁত দিয়ে কামড়ায়, কোন সময় এক ঝাঁক এরোপ্লেন পাঠিয়ে বোমা বৃষ্টি করায়।

মন্দা একদিন সুধাকে বলল, 'মা, আজ বাড়ী থেকো, সন্ধেবেলা অনাদি আসবে। বাবাকে বলতে পারবে না, তোমায় বলবে। তুমি বাবাকে বোলো।'

সুধা ভয়ানক চিন্তিত হয়ে বলল, 'অনাদি? তাই তো।'

মন্দার মুখ গম্ভীর হল, চোখ বড় হল, দৃষ্টিতে তীব্রতা এল। তীব্র মাকে একটি আঙুল দেখিয়ে বলল, 'তুমি ভাবচ এখনো আমি কচি-খুকীটি আছি, না? কিছু বোঝো না, কেন ভেবে মর, কি দরকার তোমার এত ভাবনার? কাল সন্ধেবেলা সমীর আসবে—আসতে বলেছি।'

সুধার বয়স প্রায় পঞ্চাশে এসে ঠেকেছে, বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা

কণ্ঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের জটিলতাগুলি সরল হতে আরম্ভ করায় ভয় পরিণত হয়েছে বুকের ধড়পড়ানিতে আর চালাকি পরিণত হয়েছে প্রায় নির্বুদ্ধিতায়। কিছুই যেন সহজে বোধগম্য হয় না। গল্পের মাঝখানে আমার গল্প ব্যাখ্যা করার মত মন্দাকে তাই আবার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে হয়।

'আমি ওপরে থাকব। সমীর এলেই অনাদির কথাটা বলবে—বেশ হাসিমুখে বলবে, তোমাদের যেন মত আছে এমনিভাবে, বুঝলে? তারপর সমীরকে ওপরে আমার ঘরে পাঠিয়ে দেবে, বুঝলে?'

সুধা কাতরকণ্ঠে বলল, 'এসব তুই কি বলছিস মন্দা? আজ অনাদি কাল সমীর—এসব কোন দেশী কাণ্ড?'

সুধার তখনকার মুখ দেখেই যে কোন বুদ্ধিমতীর রাগ করার কথা, তবু সুধার কথা শুনেই যেন হঠাৎ নিজের বিপন্ন অবস্থাটা খেয়াল করে মন্দা একেবারে ঝিমিয়ে গেল। গম্ভীর মুখ ম্লান হল, বড় চোখ স্তিমিত হল, দৃষ্টি ভিজে এল। কাঁদ' কাঁদ' হয়ে বলল, 'কেন ভাবচ তুমি? ভেবোনা। সমীরের জন্যেই তো—না বলালে কোনদিন মুখ ফুটে বলবে ভেবেছ?'

বলে সুধাকে হাত ধরে বসিয়ে তার পাশে বসে কোলে মুখ গুঁজে মন্দা আরম্ভ করে দিল কান্না। সুধার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। আহা, সমীরের জন্য মেয়ে যখন তার এমন করে কাঁদছে, সমীরকে নিয়েই সে তার নীড় বাঁধুক। কি আসে যায় একটু যদি একগুঁয়ে মানুষ হয় সমীর, অনাদির সঙ্গে কবে একটু বাড়াবাড়ি করেছিল বলে মেয়েকে যদি এতকাল একটু পীড়ন করেই থাকে সমীর? সব ভাল যার শেষ ভাল।

তোমরা সবাই ভালো

আঠার মিনিট লেট! সারারাত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে কলকাতা পৌঁছুতে আঠার মিনিট লেট করে গাড়ীটা কি অমার্জ্জনীয় অপরাধই তার কাছে করেছে!

দিবাকর বাবুর বোন সুবালা জিজ্ঞেস করল, 'গাড়ীতে ভিড় ছিল না?'

'ভীষণ ভিড়। কোনমতে একটু বসবার যায়গা পেয়েছিলাম।'

সুবালা ভাবল, ছেলেটা কি মিথ্যাবাদী! সারারাত গাড়ীতে জেগে বসে এলে কারো এমন তাজা চেহারা থাকতে পারে!

'সারা রাত ঘুমোও নি বুঝি?'

'ঘুমিয়েছি। আমার এই বাক্সে পা ঝুলিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে বেঞ্চে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে দেখি একেবারে নৈহাটি পৌঁছে গেছি।'

ষ্টীলের ফোঁড়ায় কণ্টকিত তার ট্রাঙ্কটির দিকে তাকিয়ে কেবল সুবালা নয় উপস্থিত সকলেই শিউরে উঠল। ট্রাঙ্কের ওপর বিছানা পেতে নিয়েছিল নিশ্চয়? কিন্তু বিছানা কই রমেনের? সঙ্গে তো শুধু একটা সতরঞ্চি!

'আমি তো তোষক বালিশে শুই না। চৌকীতে সতরঞ্চি বিছিয়ে চাদর পেতে নিই। শক্ত বিছানায় শোয়া খুব উপকারী পিসীমা।'

পিসীমা? কাকে সে পিসীমা বলছে?

'আমি তোমার পিসীমা নই।' সুবালা প্রতিবাদ জানাল।

'পিসীমাই হন আপনি।' রমেন মৃদু মৃদু হাসছে!

'আমি তোমার এই পিসে মশায়ের বোন—ছোট্ট বোন।' সুবালা দিবাকর বাবুকে দেখিয়ে দিল। 'তোমার পিসীমা রান্নাঘরে আছেন।'

মনে মনে সুবালা ভীষণ চটে গেল। কোথাকার হনুমান ছেলে! দিবাকর বাবুর বয়স ষাট হতে চলল, রমেনের পিসীমার বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, আর তাকে সে মনে করে বসল পিসীমা, বয়স তার এখনো সাতাশ হয় নি! চোখে না দেখে থাকলেও এটুকু তো তার জানা আছে যে তার পিসীমার বড় ছেলেটার একটা মেয়ে হয়েছে সম্প্রতি, তার পিসীমার এখন ঠাকুরমা পদবী!

রমেন বলল, 'এই পিসীমার সম্পর্কে আপনাকে পিসীমা বলিনি। নন্দ পিসেমশায়ের সম্পর্কে আপনি পিসীমা হন।'

শুনে কেবল সুবালা নয়, উপস্থিত সকলেই থ বনে গেল। সকলের মনে পড়ল, সত্য সত্যই রমেনের সঙ্গে সুবালার দু'দিক থেকে সম্পর্ক আছে, সে তার এক পিসেমশায়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। দিবাকর অনেক অনেক দূর সম্পর্কের পিসেমশায়, কিন্তু প্রথমে রমেনের বাবার মাসতুতো বোনকে বিয়ে করেছিলেন বলে সুবালার স্বামী নন্দগোপাল তার খাঁটি মাসতুতো পিসেমশায়। ছেলেটা তবে ভুল করেনি, সুবালাকে জন্মে কখনো চোখে না দেখে থাকলেও সে যে কে মনে মনে আন্দাজ করে তার সঙ্গে ডবল সম্পর্কের মধ্যে কোনটা বেশী লাগসই তাও স্থির করে ফেলেছে। এতো যেমন তেমন ছেলে নয়!

ইতিমধ্যে দিবাকর বাবুর স্ত্রী এসে পড়েছিলেন। মানুষটা তিনি রোগা এবং লম্বা, মুখখানা বদমেজাজী। চশমার ভেতর দিয়ে রমেনকে

নিরীক্ষণ করে তিনি যথাবিহিত স্নেহাদ্র বিস্ময়ের ভদ্রতঃ করে বললেন, 'ওমা, তুমি চারুদাদার ছেলে ?'

রমেশ বলল, 'বাবাকে আপনি দাদা বলেন পিসীমা ? আমি শুনেছিলাম বাবা আপনার চেয়ে ছোট।'

পিসীমা ঢক্ করে একটা ঢোঁক গিলে ফেললেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'হ্যাঁ, দাদা বলি।' তারপর প্রায় ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'নাও, জামা কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে নাও।'

রমেনের প্রণাম গ্রহণের জন্য গুরুজনেরা প্রস্তুত হয়ে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন, ভাবছিলেন প্রণাম করার কথাটা বুঝি তার মনে নেই। রমেন জামার বোতাম খুলতে আরম্ভ করায় সুবালা আর চুপ করে থাকতে পারল না।

'পিসীমা পিসেমশাইকে প্রণাম কর রমেন।'

'আমি তো কাউকে প্রণাম করি না, ছেট পিসীমা ?'

'প্রণাম কর না।'

'প্রণাম করা ছেড়ে দিয়েছি !'

এমন ভাবে রমেন কথাটা বলল, যেন একটা তার বদ অভ্যাস ছিল, খুব মনের জোর দেখিয়ে অভ্যাসটা ত্যাগ করেছে। সুবালা আর পিসীমা বাক্যহারা হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। পিসীমার সেজ মেয়ে রাণী খিল খিল করে হেসে উঠেই বিবর্ণ হয়ে চুপ করে গেল। দিবাকরবাবু ঘরে আছেন ভুলে গিয়ে সে হেসে ফেলেছিল। বাড়ীতে, বিশেষ করে তার সামনে, কারো শব্দ করে হাসাটা দিবাকরবাবু পছন্দ করেন না। অন্য সময় হয়তো তিনি হাসি বন্ধ করা সত্ত্বেও রাণীকে ধমক দিতেন, এখন নবাগত ছেলেটার চমকপ্রদ পাকামিতে শুম্ভিত হয়ে বাওয়ায় মেয়েকে শাসন করতে বোধ হয় ভুলে গেলেন। ষতবড় বেয়াদপ

হোক, বাড়ীতে যে পা দিয়েছে মোটে পাঁচ মিনিট, তার ওপর গর্জ্জন করে ওঠা উচিত নয় ভেবে আত্মসম্বরণের অতি কষ্টকর চেষ্টায় কাতর হয়েই সম্ভবতঃ তিনি হঠাৎ ধপ করে চৌকীতে বসে পড়লেন। চৌকীটা কচ্‌মচ্‌ শব্দ করে প্রতিবাদ জানাল। দিবাকর বাবুর দেহটি প্রকাণ্ড, চুলে পাক ধরলেও গায়ে তার এখনো অসম্ভব জোর। এই কদিন আগে তার বিরাট থাবার থাবড়া খেয়ে মেজছেলে সুকান্ত ভিরমি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল।

সকলের মুখের ভাব দেখে রমেন কি বুঝল সেই জানে, ক্ষমা প্রার্থনার সুরে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'তাই বলে গুরুজনদের ভক্তি করি না ভাববেন না কিন্তু ছোট পিসীমা। মানুষের পায়ে কত ধূলোবালি ময়লা লাগে, পায়ে হাত দেয়া উচিত নয় বলে প্রণাম করিনা। বাবাও তাই বলেন। গুরুজনকে ভক্তি করি, পায়ের ময়লাকে তো ভক্তি করিনা। একজনের পা থেকে ময়লা নিয়ে নিজের কপালে লাগানোর কোন মানে হয়?'

দিবাকরবাবু আর সামলাতে পারলেন না, সিংহের মত গর্জ্জন করে উঠলেন, 'মানে বুঝেছি।' তুমি একটি এক নম্বরের জ্যাটা ছেলে। যা, ওঘরে যা।'

রমেন যেন আশ্চর্য্য হয়ে গেল, একপা দিবাকরবাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল 'রাগ করলেন পিসেমশাই?'

দিবাকরবাবুও নির্ব্বাক বিস্ময়ে একটুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে চৌকী ছেড়ে উঠে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রমেন আপন মনে বলল, 'পিসেমশাই রাগ করেছেন।'

সে যেন বুঝতে পারছে না কেন দিবাকরবাবু রাগ করলেন, তার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না দিবাকরবাবু সত্য সত্যই রাগ করেছেন।

বেলা তখন প্রায় এগারটা বাজে। রমেনকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কারও ছিল না। লোক তো বাড়ীতে কম নয়, নাওয়া খাওয়ার হাঙ্গামাও তাদের সহজ নয়। তাছাড়া আশ্রিত হিসাবে বাড়ীতে থাকবার জন্য যে এসেছে তাকে নিয়ে অত ব্যস্ত হবার গরজই বা হবে কার।

রমেনের ট্রাঙ্কটা বৈঠকখানা থেকে ভেতরের একটা ঘরে নিতে সাহায্য করে সেই যে চাকরটা কোথায় গেল আর তার পাত্তা নেই। দরজার সামনে দিয়ে যাবার সময় সুবালা একবার রমেনকে চান করে নিতে বলে গেল, আর কেউ খবর নিতে এল না। ঘরটা বেশী বড় নয়, দুটি চৌকি একটী টেবিল আর দু'খানা রঙ করা লোহার চেয়ার আছে। দুটি চৌকিতেই বিছানা গুটানো আছে। একটি সুকোমলের, অন্যটি দিবাকর-বাবুর ছোট ভাই সুধাকরবাবুর শালা রঞ্জিতের। টেবিলের একপাশে আই, এ, ক্লাসের বই, বাকী অংশ জুড়ে স্কুলের নীচু ক্লাসের ইংরাজী বাংলা অঙ্কের মলাট ছেঁড়া বই আর খাতা ছড়ানো। দেয়ালে বসানো কাঠের তাক দু'টিতে ঘুড় লাটাই, মার্বেল, রবারের বল, টিনের কৌটা, কাগজের বাক্স থেকে সুরু করে পালিশ-চটা জুতো পর্য্যন্ত কি যে নেই বলা কঠিন। সুকোমল আর রঞ্জিৎ এ ঘরে থাকে এবং বাড়ীর গণ্ডা দেড়েক ছেলে মেয়ে দুবেলা এ ঘরে বসে নকুল মাষ্টারের কাছে পড়াশোনা করে।

সুকোমল সঙ্গে এসেছিল, তার সঙ্গে দু'চারটি কথা বলার চেষ্টা করে রমেন সুবিধা করতে পারল না। কাটা কাটা জবাব দিয়ে সুকোমল কুটিল চোখে তাকে শুধু তাকিয়ে দেখতে লাগল। রমেন যখন ট্রাঙ্ক খুলে তার বই আর কাপড় বার করছে, হঠাৎ সে চিবিয়ে চিবিয়ে মন্তব্য করল, 'আমি ভাবছিলাম তোমায় ওপরে ভাল ঘরে থাকতে দেবে।'

'ঘর খালি নেই নিশ্চয়।'

'নেই ? দেখে এসো না আছে কিনা। দোতলায় আছে তিনতলায় আছে। সব বড়মামার নিজের লোকের দখলে—এক একজনের এক একটা ঘর ! খাটে না শুলে বড়মামার ছেলেমেয়েদের ঘুম আসে না।'

'খাটে শুয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে হয়তো।'

সুকোমল ফোঁস করে উঠল, 'আমরা কেন নীচের স্যাতসেতে ঘরে গাদাগাদি করে থাকব ?'

'পিসেমশায়ের ভাইও তো নীচের তলায় থাকেন ভাই।'

'সাধে থাকেন ? বাত নিয়ে সিঁড়ি ভাঙ্গতে পারেন না বলে। ছোট মামীরা ওপরে থাকেন।' রাগে অভিমানে সুকোমলের মুখখানা বাঁকা দেখায়, 'এইতো সবে এলে। দু'দিন থাকো, টের পাবে আমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে। বাড়ীতে থাকতে দিয়েছে তাই যেন ঢের !'

রমেন একগাল হেসে বললে, 'ধেৎ, তাই কখনো হয় ? খারাপ ব্যবহার যদি করবে, বাড়ীতে থাকতে দেবার দরকার ! মনে কষ্ট দেবার জন্যে কেউ কাউকে ইচ্ছে করে বাড়ীতে রাখে নাকি ?'

সুকোমল হতভম্বের মত বলল, 'রাখে না ?'

রমেন বলল, 'কেন রাখবে ? একজনকে কষ্ট দিলে নিজেরও কষ্ট হয়, মিছামিছি নিজে কষ্ট পাবে এমন বোকা কেউ নয় ভাই। আমরা জোর করে থাকতে আসতাম তা'হলে বরং কথা ছিল। তাতো আমরা আসিনি। আমার কথা ধরো। বাবা পিসেমশাইকে লিখলেন আমি এখানে থাকতে পারব কি না, পিসেমশাই জবাবে আমাকে পাঠিয়ে দিতে লিখলেন-- লিখলেন, কোন অসুবিধে নেই। অনাদর করবার জন্যে আমাকে ডেকে আনার তাঁর কি দরকার ছিল ? বাবাকে তাহলে লিখে দিতেন সুবিধে হবে না।'

কথা বলতে বলতে রমেন টেবিলে ছড়ানো বইগুলি গুছিয়ে ফেলেছে।

বইখাতা সমস্ত টেবিল জুড়ে ছিল, এখন দেখা গেল টেবিলে অনেক জায়গা। তাকের জঞ্জালগুলি সরিয়ে, নামিয়ে, সাজিয়ে গুছিয়ে যায়গা খালি করতে করতে রমেন হঠাৎ বলল, 'তুমি ওপরের ঘরে থাকবে ভাই? আমি ব্যবস্থা করে দেব।'

রমেন ব্যবস্থা করে দেবে! সেই যেন বাড়ীর কর্ত্তা! সুকোমল চটে গিয়ে একটা ব্যাঙ্গোক্তি করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার মনে হল রমেন বাহাদুরী করে নি, ওপরে তার থাকবার ব্যবস্থা করার ক্ষমতায় নিজের বিশ্বাসটা শুধু প্রকাশ করেছে।

'আমার দরকার নেই।'—সুকোমল জবাব দিল।

এগারটা পর্য্যন্ত নীচের তলায় কোনরকম গোলমাল ছিল না, তারপর এমন হৈ চৈ হট্টগোল সুরু হয়ে গেল যেন হাট বসেছে।

সুকোমল বলল, 'বড় মামা ওপরে গেলেন।'

এ বাড়ীতে দিবাকর বাবুর প্রচণ্ড শাসন কেবল তার নিজস্ব সুখসুবিধা আর জ্বালাতন হওয়া না-হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। চোখ আর কাণের আড়ালে কি ঘটছে না ঘটছে সে বিষয়ে তার কিছুমাত্র মাথা ব্যথা নেই, তার সামনে সবাই ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে চলাফেরা করবে, জোরে কথা বলবে না, হাসবে না, ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত চেঁচামেচি দুরন্তপণা বন্ধ রাখবে—এইটুকু হলেই তিনি সন্তুষ্ট। তাই, তিনি একতলায় নামলে দোতালা হাঁফ ছেড়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, দোতলায় উঠে গেলে একতলায় সুরু হয় চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি। বড়রা অবশ্য মারামারিটা করে না; সেটা ছেলেমেয়েদের একচেটিয়া হয়েই থাকে, বড়রা শুধু তাদের মারে। যখন তখন যার যাকে খুসী হরদম মারে। মনের মধ্যে সকলে

যেন কি জ্বালা পুষে রেখেছে, ছোটদের ওপর কারণে অকারণে ঝাল না ঝেড়ে থাকতে পারে না।

নিজের বই খাতা গুছিয়ে রমেন একা ঘরে বসে আছে। সুকোমল বলেছিল, সারাদিন না খেয়ে ঘরে বসে থাকলেও কেউ আর তাকে ডাকতে আসবে না। রমেন তা স্বীকার করেনি এবং তার ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেবার জন্য তাকে নাইতে পাঠিয়ে নিজে প্রতীক্ষা করছে। তেল মেখে গামছা হাতে সে একেবারে তৈরী হয়ে আছে, দু'চার মিনিটের মধ্যেই যে আদর আহ্বান আসবে তাতে যেন তার কিছু মাত্র সন্দেহ নেই।

সুধাকর বাবুর স্ত্রী মনোরমা সত্যসত্যই কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘরে এলেন। ঠিক নাইতে যাওয়ার আহ্বান নিয়ে নয়, পরিচয় করতে। রমেনের বেয়াদবির গন্ধ ইতিমধ্যেই মুখে মুখে আলোচিত হয়ে উপন্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, মনোরমা এতক্ষণ তাই শুনছিলেন। দিবাকরবাবুর স্ত্রী অনুপমা আর সুধাকরবাবুর স্ত্রী মনোরমা এই দু'টি জা'য়ের মনের গতি সর্ব্বদাই পূব আর পশ্চিমের মত পরস্পরবিরোধী। একজন লালপাড় শাড়ী পরলে অন্যজন পরেন কালোপাড় শাড়ী, একজন রুইমাছ খেলে পরে অন্যজন খান কৈ মাছ, একজন কারো নিন্দে করলে অন্যজন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। একজনের কোন ছেলে বা মেয়ে পর্য্যন্ত যদি অন্যজনের একটু বেশী আদর পায়, নিজের সেই ছেলে বা মেয়েকে ধরে তার মা আচ্ছা করে পিটিয়ে দেন। এখন, রমেন যখন আজ এল, মনোরমার-কাছে সংবাদ ঠিকমতই পৌঁছেছিল কিন্তু অনুপমা তাকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলেন বলে তিনি তাকে একবার চোখের দেখা দেখতে যাওয়াও উচিত মনে করেন নি। তারপর অনুপমা যখন তীব্রভাবে রমেনের নিন্দে সুরু করলেন এবং স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করে দিলেন

যে বাড়ীর ছেলেদের মাথা খাবার জন্য এ শনিগ্রহকে তিনি বাড়ীতে যায়গা দিতে পারবেন না, দু'চারদিন দেখে দূর দূর করে খেদিয়ে দেবেন, তখন মনোরমার মনে হল এই তেজী, সুবিবেচক, আদর্শ চরিত্র ছেলেটির সঙ্গে তো অতি অবশ্য তার ভাব করা দরকার! ঘরে ঢুকেই তাই হাসিমুখে অত্যন্ত মিষ্টি সুরে বললেন, 'একলাটি বসে আছো বাবা? বাড়ী ছেড়ে এসে মন কেমন করছে?'

রমেন কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল—'হ্যাঁ।'

মনোরমা একটু ভড়কে গেলেন। এত বড় ধাড়ী ছেলের মুখে এমন ধারা জবাব কি শোভা পায়? বাড়ীর জন্য মন কেমন করার অভিযোগ রমেন অস্বীকার করলে তিনি তাকে কি বলবেন মনে মনে তাই মনোরমা ঠিক করে রেখেছিলেন, চার পাঁচ বছরের ছেলের মত সে সহজ সরল জবাব দিয়ে বসায় তাকে এবার কি বলবেন খানিকক্ষণ তিনি ভেবেই পেলেন না। বোকা হাবা নয়তো ছেলেটা? মাথার কোন দোষ নেই তো?

সহজ ও অকৃত্রিম আবেগের অনভ্যস্ত ধাক্কা সামলে মনোরমা তারপর বললেন, 'প্রথম দু'চার দিন ওরকম লাগবে বাবা। তা আমরাও তোমার পর নই। আমি হলাম গিয়ে তোমার—' মনোরমা থমকে থেমে গেলেন। তিনি রমেনের কে হন? দূর সম্পর্কের পিসীমার জা'এর সঙ্গে কি সম্পর্ক হয়?

'আপনি আমার ভালো পিসীমা।'

পিসীমা? তাই বটে, রমেনের পিসীকে তিনি যখন দিদি বলেন, তিনিও রমেনের পিসীমা হন বটে। কিন্তু ভালো পিসীমা কেন? ছোট, বড়, মেজ, সেজ, রাঙা, কালো মাসী পিসী দিদি বৌদি শুনেছেন, ভালো-পিসীমা তো শোনেননি কখনো! তিনি কি ভালো? রমেন কি দেখেই চিনেছে

তিনি মানুষটা মন্দ নন, মন তার ভালো? মনোরমা একটা বিস্ময়কর আনন্দ অনুভব করেন। অনেক দিন ধরে মনের ওপর যেন একটা ভার চাপানো ছিল, ভারটা হাল্কা হয়ে গেছে। কতকাল ধরে শুনে আসছেন তিনি হিংসুটে, স্বার্থপর, ঝগড়াটে এবং আরও অনেক কিছু! শুনতে শুনতে ধারণা জন্মে গেছে যে তিনি সত্যই তাই। হিংসা, স্বার্থপরতা আর ঝগড়াঝাটি নিয়েই দিনও তার কাটছে বৈকি। রমেনের কথা শুনে হঠাৎ মনে হল, ওসব কিছু নয়, অনেক কাল আগে অল্প বয়সে যেমন ছিলেন এখনো তেমনি আছেন,—সাদাসিদে ভালোমানুষ। তিনি ভালো।

কাছে বসিয়ে আদর করে মনোরমা রমেনকে খাওয়ালেন। অনুপমার পিত্তি জ্বলিয়ে বার বার বলতে লাগলেন, খাসা ছেলে দিদি। ছেলে-মেয়েদের একটিবার ধমক দিলেন না, কারো দিকে কড়া চোখে তাকালেন না, ছেলেবুড়ো চাকর-দাসী প্রত্যেকের সঙ্গে কথা কইলেন হাসিমুখে। মনে হতে লাগল, খোলস ছেড়ে মনোরমা যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছেন। খাওয়ার পর তিনিই রমেনকে বললেন, 'এইটুকু ঘরে কি তিনজনের যায়গা হয়? তুমি ওপরে থাকবে রমেন?

তখন রমেন বলল, 'ভালো-পিসীমা, আমি এ ঘরে থাকি, সুকোমলকে ওপরে নিয়ে যান।'

মনোরমা হেসে বললেন, 'এ ঘরে থাকতে চাও তুমি? বেশ বাবা, তাই হবে। সুকোমল ধীরেনের ঘরে যাক, তুমি এখানেই থাকো।'

এ ব্যবস্থায় খুসী হওয়ার বদলে সুকোমল কিন্তু ভয়ানক চটে গেল। তার আত্মসম্মানে ঘা লাগল কিনা। এতদিন বাড়ীর লোকের উপেক্ষায় তার অভিমানের সীমা ছিল না, আজ তাদের পক্ষপাতিত্বে সে হিংসায় পুড়তে লাগল। তাকে কেউ গ্রাহ্যও করে না, রমেনের মুখের কথায়

তার দোতলায় ভাল ঘরে থাকবার ব্যবস্থা হয়ে যায়। বাড়ীতে পা দিয়েই ছেলটার এতখানি প্রতিপত্তি জন্মে গেছে ?

কৃতজ্ঞতা বোধ করার বদলে রমেনের বিরুদ্ধে সে তীব্র বিদ্বেষ অনুভব করতে লাগল। তার মনে হতে লাগল, উপকার করার বদলে রমেন তাকে ভীষণ অপমান করেছে। মনটা তার আরও বেশী খিচরে গেল, ওপরের ঘরে যেতে একান্ত অনিচ্ছা জানাতেও কেউ যখম তার কথা কানে তুলল না, ধমক দিয়ে জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল দোতালায়।

কেবল সুকোমল নয়, অনুপমারও এমন রাগ হল বলবার নয়। একে তো প্রথমেই রমেনের ব্যবহারে তিনি বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন, তার ওপর তার সম্পর্কে তার বাড়ীতে এসে মনোরমার দলে ভিড়ে তাকে যে অপমানটা সে করল তার জ্বালা চেপে রাখতে গিয়ে গায়ে জ্বর আসার মত শিউরে শিউরে উঠতে লাগলেন। মুখে যাই বলুন, দু'দিন দেখে সত্যি সত্যি কি আর রমেনকে তিনি তাড়িয়ে দিতেন। এখন মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করে বসলেন, ভৈরাত্রি পোয়ানোর আগে ছোঁড়াটাকে তিনি বিদেয় করবেন, কাণ্ড করে ছাড়বেন একটা। তাকে ডিঙিয়ে তার ভাইপোকে ছোট-বৌ কিসের জোরে দখল করে তাও দেখে নেবেন।

দুপুরবেলা একবার অনুপমার ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় ভেতরে রমেনের সঙ্গে তাকে গল্প করতে দেখে মনোরমার চশমা পরা চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম হল।

নিজের ঘরে গিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন, না, আগে রমেনকে বাড়ী থেকে তাড়ান হবে না। আগে শিক্ষা দিতে হবে ছোট-বৌকে। রমেনকে বশ করে ওকে দিয়ে অপমান করতে হবে। ডাকলে রমেন ছোট-বৌয়ের কাছে যাবে না, কথা বললে শুনবে না, অবজ্ঞা দেখাবে,

অপমান করবে—এই যদি করতে পারেন, তবেই অনুপমার বেঁচে থাকা সার্থক।

রমেনকে দেখেই সকলের মনে যে একটা দুর্ব্বোধ্য অস্পষ্ট আশঙ্কা জেগেছিল, দেখা গেল সেটা একেবারেই অমূলক নয়। ছেলেটাকে আয়ত্ত করা একরকম অসম্ভব। তাকে স্নেহ করার, খাতির করার, খুসী করার, আঘাত দেওয়ার কোন প্রচলিত পদ্ধতি কারো জানা নেই। নিজে থেকে কাউকে সে এড়িয়ে চলে না, কারো সঙ্গে বেশী খাতির জমানোর চেষ্টা করে না, একজনকে ছোট করে আরেকজনকে বড় করার এতটুকু উৎসাহও তার নেই। বেশী বেশী আদর যত্ন স্নেহ মমতা দিয়ে তাকে বশ করা যেমন অসম্ভব, অবজ্ঞা করে নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে তাকে কাবু করাও তেমনি অসম্ভব। মমতা আর অবহেলার দাম তার কাছে যেন সমান। কয়েকদিনের মধ্যে তার ব্যাপার দেখে অনুপমা আর মনোরমা দু'জনেরি ধাঁধা লেগে গেল। প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাদের দু'জনের মধ্যে কেউ রমেনের এতটুকু পক্ষপাতিত্ব অর্জ্জন করতে পারলেন না। কিশোর সন্ন্যাসীর মত সে যে একেবারে নির্ব্বিকার হয়ে থাকে না নয়, ভালবাসা দেখালে শিশুর মত খুসী হয়ে উঠে, কিন্তু গলে পড়ে না। ভালবাসা দেখানোর আগে যেমনটি ছিল পরেও তেমনি থাকে। লেজও নাড়ে না, পা'ও চাটে না!

প্রথমদিন অনুপমা ভেবেছিলেন, মনোরমা আগেই ভাব আরম্ভ করেছে তার সঙ্গে তিনি বোধ হয় পাল্লা দিতে পারবেন না। বিকালে মিষ্টি আনিয়ে লুচি ভেজে রমেনকে খেতে দিলেন। অন্য সকলেই অবশ্য লুচি আর মিষ্টি খেল, কিন্তু তার মিষ্টি কথাগুলি পেল শুধু রমেন। পুলকিত হয়ে অনুপমা লক্ষ্য করলেন, এ বাড়ীতে তাকেই যেন সে আপন মনে করে, তার স্নেহ আর যত্নই যেন সে চায়, এমনি ভাব রমেনের। নতুন

পরিচয়ের সঙ্কোচ নেই, পর মনে করা নেই। কি আগ্রহের সঙ্গেই রমেন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সেই প্রাইজগুলি আছে পিসীমা? দেখাবেন আমায়?'

কবে সেই অল্প বয়সে সেলায়ের কাজ আর গানের জন্য অনেকগুলি প্রাইজ পেয়েছিলেন, বাপের কাছে শুনে সেগুলি দেখবার জন্য রমেন উৎসুক হয়ে আছে! মনটা অনুপমার কেমন করে উঠল। কই, দশ বিশ বছরের মধ্যে কেউ তো কোনদিন জানবার আগ্রহ দেখায়নি তার এককালে বিশেষ কি গুণ ছিল, কিসের জন্য বাড়ীতে আর পাড়াতে এককালে তিনি সকলের মুখে নিজের প্রশংসা শুনতেন! আজ আড়ালে লোকে তাকে শুঁটকি মাছ বলে, তার মাথায় নাকি ছিট আছে, খালি চোখে তাকালে ছেলেপিলে ভস্ম হয়ে যেতে পারে বলে তিনি নাকি চশমা পরে থাকেন! সত্যিই কি তিনি এই রকম মানুষ? বড় ট্রাঙ্কের তলা থেকে খুঁজে পেতে পুরাণো দিনের প্রাইজগুলি দেখাবার সময় রমেনের চোখভরা বিস্ময় ও শ্রদ্ধা দেখে তো তার মনে হচ্ছে আজও তিনি সেই আগের অনুপমার মতই আছেন, যাঁর হাসিখুসী ভাব আর মিষ্টি স্বভাবে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত, পাড়ার মেয়ে বৌ ভিড় করে যার কাছে আসত সেলাই শিখতে আর গান শুনতে!

অনুপমা স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলেন ভেতরটা তার অনেকদিন শুকনো হয়ে ছিল আজ হঠাৎ একটা মধুর রসালো আবেগে ভিজে সরস হয়ে উঠেছে। ঠিক এই রকম মনের অবস্থা ছিল বলে সন্ধ্যার পর মনোরমার ঘরে রমেনকে দেখে রাগ হবার বদলে তার খুব অভিমান হয়ে গেল। খানিক পরেই রাণীকে দিয়ে তাকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে উদাসভাবে বললেন, 'আমার নিন্দে শুনতে বেশ ভাল লাগছিল, না বাবা? আমি তো মন্দ আছিই—'

'না, পিসীমা।'

অনুপমা কাতর হয়ে বললেন, 'তুমি কি জানবে, সবাই আমায় মন্দ বলে। যার জন্যে যত করি তার কাছে আমি তত মন্দ।'

রমেন হেসে ফেলল। অনুপমা যেন হাসির কথা বলেছেন এমনি ভাবে হেসে ফেলল।—'কেউ মন্দ বলে না পিসীমা। আপনি কেন মন্দ হতে যাবেন? ভালো-পিসীমা নিন্দে করেন নি, দুঃখ করছিলেন। আপনি নাকি আগে খুব ভালবাসতেন ভালো-পিসীমাকে এখন আর বাসেন না। শুনে আমি কি বললাম জানেন?'

'কি বললে?'

বললাম, 'তা নয় ভালো-পিসীমা, পিসীমার শরীর ভাল নেই। তাই আগের মত আদর যত্ন করতে পারেন না। সত্যি নয়?'

সত্যি নয় আবার। আজ কতকাল ধরে কত অসুখে ভুগছেন পিসীমা কে তার খবর রাখে। কে তাকিয়ে ভাখে তার দিকে, তিনি মরলেই বা কার কি এসে যায়। সংসারের জন্য উদয়াস্ত তিনি খেটে যাবেন, সকলের ভাবনা ভেবে জর্জরিত হবেন, তা'হলেই সবাই খুসী। কিন্তু এ ছেলেটার দয়ামায়া আছে, দেখেই বুঝতে পেরেছে তার শরীর ভাল নয়।

'ছোট বৌ কি বললে?'

'বললেন স্বর্ণসিন্দুর খেলে আপনার উপকার হবে। ওঁর এক মামা কবিরাজী করেন, তার কাছে খাঁটি ওষুধ পাওয়া যায়, আনিয়ে দেবেন বললেন।'

অনেককাল পরে সেদিন রাত্রে ছেলেকে খেতে বসে অনুপমা আর মনোরমার মধ্যে কিছুক্ষণ সুখদুঃখের গল্প হল।

তারপর কাটল অনেকগুলি দিনরাত্রি। বাড়ীর অসংখ্য সংঘর্ষ, ছোট আর বড়, সামান্য ও সাংঘাতিক, যেন আপনা থেকে উপে যেতে লাগল অতীতে। একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখা দিল বাড়ীতে।

সবাই ভাবতে লাগল, আমি ভালো। আমি কেন খারাপ হতে যাব ?

চুরি চুরি খেলা

দ্রষ্টব্য খুব বেশী অসাধারণ নয়, কিন্তু কমলার দেখিবার ভঙ্গিতে মনে হয় এ যেন পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অপূর্ব্ব দৃশ্য।

মাঠের দক্ষিণে একসারি নিস্কম্প নারিকেল তরু, মাঠের মাঝখানে পাতা ঝরা একটি পেয়ারা গাছ, উত্তরে আম বাগানের জমাট শ্যামলতা এবং ইহাকে বেষ্টন করিয়া অর্দ্ধ-চক্রাকার ইটবাঁধানো লাল পথ। পথের ধারে, ঘোষসাহেবের সাদা বাড়ীর সামনে, টেলিগ্রাফ পোষ্টে হৃষ্টপুষ্ট গাভীটি বাঁধা রহিয়াছে। রায়বাবুদের জমাদার কিষণ প্রত্যহ দুইবেলা গাভীটিকে আনিয়া ওই পোষ্টে বাঁধিয়া ঘোষসাহেবের চাকরের সামনে খাঁটি দুধ দুহিয়া দিয়া যায়।

নিকটে বাছুরটি দাঁড়াইয়া আছে, নিস্কম্প, নিশ্চল,—বীভৎস। দু'মাসের বাছুরটি মানুষের সীমাহীন লোভের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পনের দিন আগে মরিয়া গিয়াছিল, মানুষ তবু তাহাকে রেহাই দেয় নাই। চামড়া ছাড়াইয়া নিয়া ভিতরে খড় পুরিয়া কাঠের পায়ে সামনে খাড়া করাইয়া প্রতিনিয়ত গাভীটিকে প্রতারণা করিতেছে।

নির্ব্বোধ পশু মৃত্যু বোঝে না। ক্রমাগত চাটিয়া চাটিয়া সন্তানের নিথর দেহে জীবনের সাড়া আনিবার চেষ্টা করে। এতদূরে জানালায় দাঁড়াইয়া তাহার গভীর কালো চোখের সকাতর চাহনি কমলা যেন

স্পষ্ট দেখিতে পায়। তার চোখ জ্বালা করিতে থাকে, সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে। ক্রুদ্ধ হৃদয়ে সে কিষণকে অভিশাপ দেয়, মানুষকে ঘৃণা করে।

তার মনে পড়ে ফুকা নামক প্রক্রিয়ার কথা, গরুর দুধ বাড়ানোর যে বীভৎস উপায়ের কথা কিছুদিন আগে সে শুনিয়াছে। কমলার মনে হয় মানুষ পারে না এমন কাজ নাই।

মাথা ঝিম ঝিম করে কমলার।

কমলা এদিকের জানালায় সরিয়া আসে।

নীচে ফুলের বাগান, বাগানের শেষে ফল বাগিচা। তাহার শেষ প্রান্তে বাদামী রঙের ঘর তিনখানা এ বাড়ীরই পরিসীমার অন্তর্গত। গাছের ফাঁক দিয়া ঘর তিনখানির দিকে কমলা শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

তার চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়ে।

বারান্দায় জুতার শব্দ হয়।

স্বামীর পদশব্দ কমলা চেনে তবু সে যেন চমকাইয়া ওঠে। ছিটকাইয়া গিয়া সে দরজায় খিল তুলিয়া দেয়।

ছোট ছোট নিশ্বাসের দোলনে তার অপরিপুষ্ট স্তন দুটিতে দোলা লাগে। কমলা ব্লাউজের বোতাম লাগায় না। লোকের সামনে শুধু শাড়ীর আঁচলটা গায়ে জড়ায়।

দরজায় টোকা দিয়া খানিকক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিয়া অনন্ত ম্লান মুখে ফিরিয়া যায়। ঘরের মাঝখানে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া কমলা যতক্ষণ শোনা যায় কাণ পাতিয়া তাহার পদশব্দ শোনে।

তার চোখ জ্বল জ্বল করে।

আজ কিন্তু অনন্ত ফিরিয়া গেল না। রুদ্ধ দরজায় করাঘাত করিয়া বলিল, আমার সাড়া পেয়ে দরজা বন্ধ করলে যে? মুখ দেখবে না?

খুলচি।

খিল খুলিতে কমলার অনাবশ্যক সময় লাগিল। হাতে সে দু'গাছা শাঁখা পরিয়াছে, খিল খুলিবার সময় সরু রুলির পাশে শাঁখা দু'টি কি চমৎকার মানাইয়াছে চোখে পড়ায় সে অবাক হইয়া গিয়াছিল।

অনন্তের বয়স ত্রিশ বত্রিশ, সুঠাম চেহারা। শরীর দেখিয়া স্বাস্থ্যের অভাব অনুমান করা যায় না, চোখ দু'টি কিন্তু তাহার সর্ব্বদা ক্লান্ত, নিদ্রাতুর। যারা হাইপাওয়ারের চশমা ব্যবহার করে, চশমা খুলিয়া রাখিলে তাদের চোখ যেমন ঢুলু ঢুলু দেখায়, তেমনি।

হাসিয়া বলিল, এ যেন আমার নিদ্রাপুরী কমলা। দুয়ার খুলেও খুলতে চায় না।

কমলা চুপ করিয়া রহিল।

কমলার মুখ দেখিয়া হাসি বন্ধ করিয়া অনন্ত বলিল, বিরক্ত করলাম?

না।

কিন্তু মুখ দেখে যে মনে হয় বিরক্তির সীমা নেই! মনে হয়—

কী মনে হয়?

অনন্ত একটু ভাবিয়া বলিল, মনে হয় এটা যেন জেলখানার সেল, আর তুমি তার কয়েদী। তোমায় জেল দিয়েছে হাকিম, কিন্তু নিরপরাধ জেলারকে দেখে রাগে চোখ লাল করে ফেলেছ।

কমলা মৃদুস্বরে বলিল, রাগে নয়।

অনুরাগে?

এই পরিহাসের জবাবে কমলা নীরব হইয়া রহিল। খাটের প্রান্তে বসিয়া তার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অনন্ত বলিল, ভূষণের অন্তর্দ্ধান, বসনের বিদ্রোহ! এ সাড়ী তোমায় কে এনে দিয়েছে শুনি?

আমার কিন্তু খুব পছন্দ হয়েছে।

এনে দিয়েছে কে?

আমি আনিয়েছি।

আমি এনে দিই নি।

কে এনে দিয়েছে শুনবে? সুশীল বাবু।

অনন্তের মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল।

সুশীল? ওকে বরখাস্ত করতে হবে।

মোটা একটা চুরুট ধরাইয়া অনন্ত গম্ভীর ভাবে ধূমপান করিতে লাগিল।

কমলা বলিল, বরখাস্ত করতে হবে কেন? আমার আদেশ পালন করেছে বলে?

না। আমার আদেশ পালন করেনি বলে।

কমলা ম্লান ভাবে হাসিল, ও! তবে বরখাস্ত করতেই হবে।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া অনন্ত বলিল, সুশীলের স্পর্দ্ধা এত বেড়েছে কেন জান কমল? ওর ছেলেকে তুমি অতিরিক্ত আদর কর বলে।

কমলা উদাস ভাবে বলিল, হবে! কিন্তু এ স্পর্দ্ধা নয়। এতে আমি ওঁর বিনয়ের লক্ষণই খুঁজে পাই। কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করছ কেন? দিও তুমি সুশীল বাবুকে বিদায় করে।

অনন্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার চুরুটের ধোঁয়া পাক খাইতে খাইতে উপরে উঠিতে লাগিল; মন্থর গতি। এদের কলহও এমনি

অলস, এমনি সংক্ষিপ্ত, এমনি ভীরু। কেহ রাগ করে না, ধৈর্য্য হারায় না, কড়া কথা বলে না। এই যে সামান্য একটু আলোচনা হইয়া গেল ইহা শুনিয়া বাহিরের লোকের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন যে, সুশীলকে বরখাস্ত করিতে না পারিলে অনন্ত বহুদিন ধরিয়া মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিবে, পারিলে তাহার জের কমলা সহজে মিটিতে দিবে না। কিন্তু ইহাদের অভিজ্ঞতা এমনি প্রচুর যে ভবিষ্যতের এই অতিরিক্ত দুর্গতির সম্ভাবনায় সন্দেহ করিবার সুযোগও পায় না। সুশীল থাক্ বা যাক্, আজ হইতে দু'জনের সম্পর্ক আরও বৈচিত্রহীন আরও নীরস হইয়া উঠিবে, কমলা চট পরিয়া থাকিলে অনন্ত তাহা দেখিতে পাইবে না, অনন্তের কোন কথার মৃদুতম প্রতিবাদ করিতেও কমলা ভুলিয়া যাইবে!

কমলার চোখ জল জল করিতে লাগিল। একি জীবন! আনন্দের অভাব শুধু নয়, নিরানন্দের প্রাচুর্য্য! অথচ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভুল অনন্ত অনেক করিয়াছে এবং তাহার মধ্যে অনেকগুলি ভুল নিন্দনীয়, কিন্তু পরমাত্মীয়ের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিতে তো খুব বেশী উদারতার প্রয়োজন হয় না। কেন সে তা পারে না? তা ছাড়া এ তো ক্ষতি, নিজেকে অধিকতর বঞ্চিত করা।

চুরুটটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অনন্ত বলিল, সময় সময় তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি লজ্জা পাই কমল।

সে তো আমারি লজ্জা।

তা বটে। কতদিন আমরা পরস্পরের কাছে লজ্জিত হয়ে আছি?

কমলা বলিল, মনে নেই।

মনে না থাকা আশ্চর্য্য কিন্তু অসঙ্গত নয়। অনন্ত আর কিছু বলিল না।

লঘুপদে ঘরে ঢুকিল মাধুরী। কোলে তার বছর দেড়েকের একটি রুগ্ন শিশু। শিশুটি ক্ষীণস্বরে কাঁদিতেছিল।

কমলার দিকে খোকাকে বাড়াইয়া দিয়া মাধুরী বলিল, গিয়ে থেকে কাঁদছে। বাপ্‌মার কাছে একঘণ্টা ছেলে থাকতে চায়না একি লজ্জা বলুন ত?

বলিয়া সে সকৌতুকে হাসিল। সে হাসিতে লজ্জার চিহ্নও ছিল না। কমলাই চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিতে পারিল না, খোকাকে কোলে নিয়া অপরাধীর মত বলিল, সুশীল বাবু কি বললেন?

মাধুরী হাসিল, কি আর বলবে? সখ মিটে বিরক্ত হয়ে উঠল। কথাতো শুনবে না! সকাল থেকে বলছি, কি হবে খোকাকে এনে? থাকবে তোমার কাছে খোকা? তা কেবলি বলতে লাগল, নিয়েই এসোনা একবার খোকাকে, দুদিন যে ওকে আমি দেখিনি। অসুখ হলে ওর ন্যাকামি যেন বেড়ে যায়।

কমলা নীরবে জানালায় গিয়া দাঁড়াইল।

দাঁড়াইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন মাধুরীর ছিল না কিন্তু কমলার পিঠে আঁচলে বাঁধা চাবির গোছার দিকে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়াই রহিল। পরের কোলে গিয়াই ছেলে যে চুপ করিয়াছে এতে তার যেন কৌতুকের সীমা নাই। ছেলে পর হইয়া যাওয়ার আনন্দ যথাসাধ্য উপভোগ না করিয়া সে যেন এখান হইতে নড়িবে না।

অনন্ত স্তিমিত নেত্রে মাধুরীর দিকে চাহিয়া ছিল, দীর্ঘ রাত্রি জাগরণের পর তার যেন বড় ঘুম পাইয়াছে। হঠাৎ সে সোজা হইয়া বসিল। [illegible] জমজমাট সৌন্দর্য্য সে জীবনে কখনো দেখে নাই,

পাথরে খোদাই করা এমন অর্থহীন তীব্র হাসিও নয়। মাধুরীর চোখের পাতাটি যেন কাঁপে না, এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে অবসাদ আসে না, অনেক দিনের ইট চাপা ঘাসের মত একমুহূর্তে সমস্ত মুখ অসুস্থ সাদা হইয়া ওঠে;—প্রতিফলিত সূর্য্যালোকের মত তার সেই বর্ণহীন শুভ্ররূপ দুই চক্ষুকে পীড়ন করে।

কমলা অস্ফুটস্বরে খোকার উদ্ধত কান্না সংযত করে, বারেকের জন্যও মুখ ফিরাইয়া তাকায় না।

কমলার দিকে চাহিয়া অনন্তের মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। পরের ছেলে কোলে নিয়া ও মুখ ফিরাইয়া তাকায় না কেন? কি ভাবে ও? সে যে সুশীলকে কেন বরখাস্ত করিতে চায় মনে মনে তারই একটা ভুল বিশ্লেষণ করিয়া চলিতেছে কি?

অনন্তের মনে হইল মাধুরী উপস্থিত না থাকিলে আজ সে কমলাকে না বলিয়া থাকিতে পারিত না, কোন নিগ্রহের একটানা আতঙ্কে তার দিনগুলি ভরিয়া উঠিয়াছে, পরের দিনের কি দুর্ভাবনায় অর্দ্ধেক রাত্রি তার বিনিদ্র কাটিয়া যায়।

অনন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। কমলাকে কি বলিতে গিয়া হঠাৎ নীরবেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নীচে নামিয়া পিছনের মৃদু আহ্বানে অনন্ত চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মাধুরী বলিল, আমি আজ নিজে সন্দেশ করেছি। খেয়ে দেখবেন কেমন হয়েছে?

অনন্ত বিবর্ণ মুখে বলিল, রোজ রোজ কষ্ট করে কেন তুমি এসব করতে যাও মাধুরী?

আমার কোন কষ্ট নেই। তবে আপনি যদি বিরক্ত হন—

তার চোখের সামনে কমলার দিকে চাহিয়া উদ্ধত হাসি হাসিবার

পর এই সকরুণ বিনয় প্রকাশে অনন্তের মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। বলিল, সুশীলের অসুখ শুনলাম—

সামান্য অসুখ। আমি কাছে থাকলে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। সারাদিন আজ কবিতা লিখেছেন—

সামান্য কয়েকটি কথায় কৈফিয়ৎ ও অনুনয়ের কি অপূর্ব্ব সমন্বয়! অনন্ত যেন হতাশ হইয়া গেল,—কবিতা?

হ্যাঁ। লিখবার সময় ওকে দেখলে আমার এমন ভয় করে! চোখ রক্তবর্ণ, কপালে একটা শিরা দপ্ দপ্ করছে—

জ্বরের জন্য বোধ হয়।

মাধুরী ম্লান ভাবে হাসিল, হবে। কিন্তু আমার ভয় করে।—কোথায় বসবেন?

লাইব্রেরীতে।

অনন্ত চিন্তিত মুখে লাইব্রেরীতে গিয়া বসিল। একটা প্লেটে একটিমাত্র সন্দেশ আনিয়া কাগজপত্র সরাইয়া টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া মাধুরী বলিল, করেছি বোধ হয় পঞ্চাশটা, খাবেন মোটে একটা।

বেশী খেলে তুমি খুসী হবে?

মাধুরী ম্লান মুখে বলিল, হ'তাম, বেশী খেলে যদি আপনার শরীর খারাপ হওয়ার ভয় না থাকত।

একটু একটু করিয়া ভাঙিয়া সন্দেশটা খাইয়া অনন্ত বলিল, জীবনটা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে মাধুরী।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কথা ওঠার পরেই জীবন সম্বন্ধে তার এই আকস্মিক

মন্তব্যে মাধুরী একটু বিস্মিত হইল। মৃদুস্বরে বলিল, জীবন দুর্ব্বোধ্য বৈকি।

একচুমুক জল পান করিয়া অনন্ত বলিল, শুধু অসামঞ্জস্য, কেবল খাপছাড়া বিধান। উচিত অনুচিতে এতটুকু মিল নেই। প্রমাণ ছাখো, শরীরে স্বাস্থ্য নেই, তোমার তৈরি সন্দেশ একটার বেশী খেতে পারিনা, মনে শক্তি নেই, সামান্য উত্তেজনার সূত্রপাতে আতঙ্ক হয়। তবু তো জীবন আমার নিঃস্ব নয়।

নয়? মাধুরীর কণ্ঠস্বর যেন অনুযোগ করিল, আপনি তো উদাসীন, সন্ন্যাসী!

অনন্ত করুণ ভাবে হাসিয়া বলিল, উদাসীন নই, ভীরু; সন্ন্যাসী নই, দুর্ব্বল। ছেলেবেলা চোর চোর খেলায় আমার ছিল বুড়ী ছুঁয়ে বিশ্রামের খেলা। আজও আমি তেমনি অশক্ত হয়ে আছি মাধুরী। নিজে চুরি হয়ে গেলেও ঠেকাবার ক্ষমতা আমার নেই। যে খেলা শক্তিমানের, আমার কি উচিত সে খেলায় যোগ দেওয়া?

মাধুরীর সমস্ত মুখ আবার সাদা হইয়া গিয়াছিল, নতচোখে অস্ফুটস্বরে সে বলিল, জানিনে। কিন্তু দুর্ব্বলের সঙ্গে ছাড়া যে খেলতে পারে না সে তবে কি করবে?

সে সকলের খেলা দেখবে, একটা মোটা বই টানিয়া নিয়া অনন্ত বলিল, হাল্কা মানুষ ভেসে উঠবে আকাশে। সেখান থেকে পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকবে। মর্ত্যের সুখদুঃখের সঙ্গে ওছাড়া তার আর সম্পর্ক কি?

আকাশ ছোঁয়া কথা। অনন্তের মুখের দিকে চাহিয়া মাধুরী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনন্ত মোটা বইটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে মাধুরী বলিল, আপনার ওষুধ আনব? কিছু খেয়ে সেটা খেতে হয়?

অনন্ত মুখ তুলিয়া বলিল, আনো। কিন্তু একটা কথা শুনে যাও। সুশীলকে বরখাস্ত করতে চেয়েছিলাম বলে কমলার সঙ্গে আজ আমার ঝগড়া হয়েছে।

আর ঝগড়া করবেন না।

বলিয়া মাধুরী ওষুধ আনিতে চলিয়া গেল।

ওষুধ খাইবার সময় অনন্তের মনে হইল একবার উপরে গিয়া গোপনে আর্শিতে দেখিয়া আসিবে তার চোখ দুটিও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে কিনা, কপালের একটা শিরা দপ্‌দপ করিতেছে কিনা। সেও কি আজ অসুস্থতার কবি নয়?

প্রথমদিন কমলা খালি পায়ে কাঁকর বিছানো পথে হাঁটিতে পারে নাই। এখন কোনই অসুবিধা হয় না।

পথের দু'দিকে ফুলের চারাগুলি যেন ফুল ফোটানোর প্রতিযোগিতা সুরু করিয়াছে। পট্‌ পট্‌ করিয়া কয়েকটা রক্তগোলাপ ছিঁড়িয়া কমলা খোকার হাতে দিল। ফুলগুলির দিকে হাত বাড়াইয়া খোকা অস্ফুট আবেদন জানাইয়াছিল বলিয়া নয়, ফুল ছিঁড়িতে আজকাল আর তার দ্বিধা হয় না।

সুশীলের ঘর তিনখানার পিছনে প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়ার ডগায় পড়ন্ত রোদ বিবর্ণ সোনার রঙ্‌ মাখাইয়াছে। আকাশে মেঘ নাই কিন্তু কার্তিকের [illegible] শূন্য ভরাট। রোদের রঙ তা আংশিক আত্মসাৎ করিয়াছে।

তিনটা সিঁড়ি ভাঙিলে একেবারে সুশীলের শয়নকক্ষে পৌছানো যায়। সুশীল শুষ্কমুখে বিছানায় বসিয়াছিল। একটু নিঃশব্দ হাসি দিয়া সে কমলাকে অভ্যর্থনা করিল।

খোকাকে নিয়ে এলাম।

তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ওটাকে ফেলে এলেই ভাল করতেন। ওকে দেখলে জীবনে আমার যত ক্ষতি হয়ে' গেছে সব একসঙ্গে মনে পড়ে।

কমলা চমকাইয়া উঠিল। জীবনে যার বোধ হয় সবটাই ক্ষতি, জীবনের সমস্ত ক্ষতির কথা তার একসঙ্গে মনে পড়া কি ভয়ঙ্কর!

সজল চোখে সে বলিল, আপনার কাছে মাপ চাইতেও আমার লজ্জা করে। জানেন, সব দেখে শুনে দিনদিন আমার স্নেহ মমতা পর্য্যন্ত শুকিয়ে উঠ্‌ছে। আপনার ছেলে আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারলে আমি বাঁচতাম।

খোকাকে সে বিছানায় নামাইয়া দিল। ক্ষীণ শিশুটি যেন ক্রমেই তার অপরাধের মত অসহ্য ভারি হইয়া উঠিতেছিল।

কমলা টুলটাতে বসিলে সুশীল বলিল, আপনাকে বলাই ভাল। খোকার জন্য আমার কোন নালিশ নেই।

কমলা সংশয় ভয়ে বলিল, কেন?

আপনার মধ্যে ও যে আমার আপন হয়ে রইল এই আমার পরম লাভ। না, কোন কিছুর জন্যেই আমার নালিশ নেই।

কমলা নীরব হইয়া রহিল। নালিশ নাই! বালিশের তলা হইতে একটি ক্ষুদ্র ছিটের জামার যে অংশটুকু বাহির হইয়া আছে সে যেন সেটা চেনে না, তাকে আসিতে দেখিয়া সুশীল যে জামাটি বালিশের

নীচে লুকাইয়াছিল এ যেন সে অনুমান করিতে পারে না! কি ভাবে তাকে সুশীল?

কমলার মনে হইল, এ তার শাস্তি। স্ত্রী-পুত্র বাঁচিয়া থাকিতে শূন্য ঘরে শূন্য মনে এর দিন কাটে, ঘরের বিশৃঙ্খলতায়, ঘরের দেয়ালে দেয়ালে, ওই মলিন শূন্য শয্যায়, বিষাদের প্রলেপ পড়িয়াছে। এ ঘরে এ ভাবে বসিয়া থাকার বাড়া শাস্তি আর কি হইতে পারে মানুষের?

অপরাধই বা তার কম কি? কিছুই তো তার অজানা নাই। প্রতিকার প্রথম হইতেই সুশীলের আয়ত্তে ছিল! যেদিন খুসী ওই রঙচটা তোরঙ্গে জামা কাপড় ভরিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া বিদায় নিলে কে তার পথ আটকাইত? এ বিপদ এমনি শ্রীহীন এমনি ভয়ানক যে পলায়নে লজ্জা ছিল না। কিন্তু দিনের পর দিন পুঞ্জিভূত সর্ব্বনাশকে সে নীরবে স্বীকার করিয়া নিয়াছে, আত্মরক্ষার চেষ্টামাত্র করে নাই। তা যে অকারণে নয় তার চেয়ে কে তা ভাল করিয়া জানে?

এলোচুলে মুখ প্রায় ঢাকিয়া গিয়াছিল, কমলা তাহা সরাইবার চেষ্টা করিল না। ঘোমটার মত কালো চুল তার মুখের লজ্জা ঢাকিয়া রাখুক।

চালে আগুন লাগার সুযোগে গৃহস্থের ঘরের ভিত্তিতে যে সিঁদ কাটিয়াছে এ ভাবেই তাহাকে লজ্জা গোপন করিতে হয়। কমলা তা জানে। অনেকদিন ধরিয়া অনেক রাত্রি জাগিয়া বাদামী রঙের তিনখানা ঘরে অনেক স্বপ্নের সংসার পাতিয়া এ বিষয়ে তার পুরাপুরি জ্ঞান জন্মিয়াছে।

ঘরের আলো আবছা হইয়া আসার সঙ্গে সুশীল কখন শুইয়া পড়িয়াছিল কমলা টের পায় নাই। মুখ তুলিয়া দেখিয়া তার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে! এতক্ষণ চুপ চাপ বাপের কাছে থাকিয়া তার দুই বাহুর আবেষ্টনীতে খোকা ঘুমাইয়া পড়ি[illegible]

খোকা বুঝি ঘুমোলো ?

সুশীল ক্লিষ্টস্বরে বলিল, হ্যাঁ। আমার গায়ের গরমে বোধ হয় আরাম পেয়েছিল।

গায়ের গরম! জ্বর বাড়ল আপনার ?

জবাবের প্রতীক্ষা না করিয়া কাছে গিয়া কমলা তার কপালে হাত রাখিল। জ্বর বাড়িয়াছে।

অসুস্থ শরীরে সারাদিন কেন কবিতা লিখলেন ?

সুশীল মৃদুস্বরে বলিল, অসুখ শরীরে বিনা কাজে দিন যে কাটে না। আলোটা জ্বালুন তো, অন্ধকার হয়ে এল। তারপর খোকাকে নিয়ে যান। অসুস্থের সঙ্গ ওর পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

কমলার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, অসুস্থের সঙ্গ কার পক্ষে স্বাস্থ্যকর। কিন্তু কণ্ঠস্বর কেমন শুনাইবে জানা না থাকায় কথা বলিতে সে সাহস পাইল না। আলোটা খুঁজিয়া নিয়া দেশলাই জ্বালিতে সে অনাবশ্যক দেরী করিয়া ফেলিল। একটু বদল না করিয়া মুখের ভাবটা সে সুশীলকে দেখাইতে চায় না।*

* হাত মক্স করার সময় লেখা।

ধাক্কা

দুইবৎসর পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যার প্রাকালে সুমতি কম্পিত পদে দুরু দুরু বুকে অক্ষয় ডাক্তারের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, আজ সে সংসারের সর্ব্বত্র মূল্য বিস্তার করিয়াছে, প্রয়োজনের কল্যাণে এত মূল্য পাইয়াছে নিজের, পরগাছা যার স্বপ্নই শুধু ত্থাখে।

আসিয়াছিল দুটি কাজের জন্য—ছেলে রাখা ও রুগ্না গৃহিণীর সেবা করা। আর এখন বাড়ীতে প্রত্যেকটি মানুষ আহার আরাম বিশ্রামের সমস্ত ভার তাহার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে। তাহারই যেন জন্ম-জন্মান্তরের দায়িত্ব।

অলকার হইয়াছে পক্ষাঘাত। অর্দ্ধাঙ্গ অবশ।

দিবারাত্রি বিছানায় শুইয়া থাকে, কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া আকাশ পাতাল ভাবে, বিড় বিড় করিয়া নিজের অদৃষ্ট-দেবতাকে শাপে আর প্রতিরাত্রে শান্ত স্বামীর সঙ্গে কলহ করে।

বলে, 'তুমি? তুমি ছাইএর ডাক্তার, কচুর ডাক্তার।

তুমি নির্লজ্জ। স্ত্রী যার এক বছরের বেশী বিছানায় পড়ে, কোন লজ্জায় সে [illegible] চিকিৎসা করতে যায় শুনি।'

উপসংহারটা করুণ !

'একটিবার খোকাকে কোলে নিতে পারিনা এমনি অদেষ্ট !'—বলিয়া সছিদ্র হাপরের মত নিশ্বাস নিতে নিশ্বাস ফেলিতে সাঁ সাঁ শব্দ করিয়া অলকা কাঁদে।

এদিকের ঘরখানা সুমতির। তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। খোকাকে বুকে ফেলিয়া গালে গাল রাখিয়া ঘুম পাড়ানোর কায়দাটা অবশ্য অলকার চোখে পড়ে নাই, ঘুমপাড়ানো ছড়াটাই শুধু কানে গিয়াছে। তাহাতেই এত !

আধ ঘুমন্ত খোকাকে কোলে নিয়া সুমতি ওঘরে যায়।

'আপনার পাশে খোকাকে একটু শুইয়ে দেব দিদি ?'

অলকার শরীর বলিতে শুধু হাড় আর চামড়া। কোটর-গত চোখে অনেকখানি জল জমিলে তবেই গড়াইয়া পড়িতে পারে। চোখ মুছিতে গিয়া তাহার সমস্ত মুখ চোখের জলে মাখা হইয়া যায়।

সে রাগিয়া বলে, 'আড়ি পেতে শোনা হ'ল বুঝি কথা ? না হল না ! কচি খুকী কিনা আমি, বুঝিনে কিছু। লজ্জা করে না ? বেহায়া !'

তাহার শীর্ণ দেহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া ওঠে। একটানা দুঃখ শ্রেয় জানিয়া সে যেন সংযম অভ্যাস করে, সুমতি প্রলোভনটা সামনে ধরিয়াছে বলিয়া তাই তার এত রাগ !

দক্ষিণের জানালার কাছে ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অক্ষয় মোটা ডাক্তারি বই পড়ে। বারেকের জন্যও সে মুখ তুলিয়া তাকায় না। ঘরে যে বেদনার একটা স্থূল অভিনয় হইয়া গেল সে বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিবার মত অনুভূতিও তাহার যেন নাই।

তা অক্ষয় এমনি বটে,—নির্ব্বিকার, নিস্পৃহ। কিছুই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। গৃহে শয্যাগতা স্ত্রীর আনন্দহীন বৈচিত্র্যহীন

বোঝা, বাহিরে কেবল রুগ্ন ও আহত মানুষের সাহচর্য্য এবং মরণের সঙ্গে অন্তহীন বোঝাপড়ার ক্ষুব্ধ স্তিমিত বিষাদ,—সবই যেন তাহার কাছে একান্ত তুচ্ছ। সুপ্রাপ্য বলিয়াই বেদনা যেন মূল্য হারাইয়াছে।

দিনটা এক প্রকার বাহিরেই কাটে।

সকাল সাতটায় ডিসপেন্‌সারীতে যায়, সেখান হইতে কলে। বাড়ী ফিরিতে একটা বাজিয়া যায়। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার আগে সে সুমতিকে জিজ্ঞাসা করে,—'ও খেয়েছে ?'

সুমতি বলে, 'হ্যাঁ।'

'তুমি ?'

মুখের দিকে তাকায় না বলিয়া প্রশ্নটা নিছক ভদ্রতাসূচক মনে হয়।

'আপনি তো জানেন আমি শেষবেলায় হবিষ্য করি।'

'ও ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ বেলায় হবিষ্য করার কি দরকার ? রাত্রে কিছু খাও না বুঝি সুমতি ?'

'খাই।'

'তবে ?'

বলিয়া জবাবের জন্ত ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া অক্ষয় উপরে উঠিয়া যায়।

জবাব যে সুমতি দিতে পারে না এমন নয়, ইচ্ছা করিয়াই দেয় না। রাত্রে সে অবশ্য কিছু জলযোগ করে কিন্তু রাত্রি এগারটার আগে নয়, তার আগে তাহার সময় হয় না। খাওয়ার সময়-বিভাগ সম্বন্ধে অক্ষয়ের সঙ্গে আলোচনা করিতে তাহার লজ্জা করে, জবাব না দিবার ইহাই কারণ।

নাওয়া খাওয়া ও বিশ্রামের জন্ত দু'ঘণ্টার বেশী সময় অক্ষয় পায় না। বাহিরে রোগী ডাকাডাকি করে, টেলিফোনের যন্ত্রটা বার বার শব্দিত

হইয়া উঠে, তিনটা না বাজিতেই আবার সে বাহির হইয়া যায়। ফেরে রাত্রি আটটা নটায়।

তখনও কিন্তু সে নিজেকে বিশ্রামের অবকাশ দেয় না। পড়ার ঘরে বসিয়া মোটা মোটা ডাক্তারি বই পড়িতে আরম্ভ করে। সুমতির মনে হয়, শোবার ঘরে ঢুকিবার সময় পিছাইয়া দেওয়ার ইচ্ছার কাছে তাহার শ্রান্তি হার মানিয়াছে।

এমন খারাপ কথা মনে হয় বলিয়া মনে মনে নিজের উপর সুমতি রাগ করে।

অলকা এদিকে নিত্যকার কলহ ও কান্নার জন্য থাকে ব্যাকুল হইয়া, বেচারীর জীবনে এখন ওইটুকুই বৈচিত্র্য; অক্ষয় ফিরিয়াছে টের পাইলেই এমন কাণ্ড আরম্ভ করিয়া দেয় যে ও ঘরে উঠিয়া না গিয়া অক্ষয়ের আর উপায় থাকে না।

অলকা বলে, 'ও ঘরে এত কি মধু ? এঘরে বসে পড়।···ত্মাখো গো, গালে আমার একটা ব্রণ উঠেছে। বড় ব্যথা।'

চটচটে ঘামে ভেজা অলকার গাল—কে যেন আঠা মাখাইয়া রাখিয়াছে। অক্ষয় আদর করিয়া তাহার গালে হাত বুলাইয়া দেয়, দুই গালে একটি ব্রণও সে খুঁজিয়া পায় না, সস্নেহে বলে, 'ইস, বড্ড ঘেমেছ যে!'

জীবন্ত পত্নীর শবের মত শীতল ক্লেদাক্ত স্পর্শ আঙুল বাহিয়া উঠিয়া অক্ষয়ের মনে ধাক্কা দেয় কিনা কে জানে। বোধ হয় দেয় না। শব ঘাঁটা অক্ষয়ের বহুদিনের অভ্যাস।

ইহার পর খানিকক্ষণ অলকা চুপ করিয়া থাকে, তারপর প্রথমে ভালভাবেই কথা বলিতে আরম্ভ করে এবং তাহা নালিশ ও কান্নায় পরিবর্তিত হইয়া যাইতে বেশী সময় লাগে না। কিন্তু অক্ষয় এমনি

নিবিষ্টচিত্তে বই পড়িয়া যায় যে সে একটা কথাও শুনিতেছে না এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে।

অলকা সহসা ক্ষেপিয়া যায়।

'—বকে মরছি, শুনছ না যে? কেনইবা শুনবে, আমি মরলেই যে তোমার হাড়ে বাতাস লাগে।'

অক্ষয় মুখ তুলিয়া নিদ্রাতুর চোখে স্ত্রীর দিকে তাকায়। বলে, 'আহা, অলক, এমন করে রাগ ক'রো না, কিছু না জেনে শুনে— তোমার কথা শুনছি বৈকি, শুনছি।'

'ছাই শুনছ! পড়া তোমার পালাবে না গো, আমি কিন্তু পালাব। আমি চিতায় উঠি তারপরেই না হয় ওসব ছাই পাঁশ পোড়ো? কদিন বাকী আর!'

অক্ষয় শান্তকণ্ঠে বলে 'দেখ দিকি তুমি কি সব বলছ! এসব বই ছাইপাঁশ মোটেই নয় অলক, সব তোমার অসুখের বই। তোমায় সারিয়ে তুলতে হবে না?'

'হবে?'

অলকা যেন স্তম্ভিতা হইয়া যায়। উত্তেজনায় মাথা উঁচু করিবার চেষ্টা করিয়া সে বলে, 'হবে? আমাকে সারিয়ে তুলতে হবে? এ তুমি কি বলছ গো! রাত জেগে আমার অসুখের বিষয়ে তুমি বই পড়! আমায় মাপ কর গো, মাপ কর।'

মাথাটা সে বেশীক্ষণ উঁচু করিয়া রাখিতে পারে না, থপ্ করিয়া বালিশে পড়িয়া যায়। বিড় বিড় করিয়া কতবার সে যে 'মাপ কর, মাপ কর' বলে তাহার ঠিকানা নাই।

কিন্তু দেখা যায় তাহার এই কৃতজ্ঞতা অস্থায়ী। চোখের জল ভাল

করিয়া শুধাইবার পূর্ব্বেই স্বামীর ভালবাসার এতবড় প্রমাণও তাহার নিকট মর্য্যাদা হারায়।

হতাশ কণ্ঠে সে বলে, 'ছাই! তুমি আবার আমায় সারিয়ে দেবে। আমি কি আর বুঝতে পারি না, কিসের জন্য তুমি বই পড়!'

'আমার মরাই ভাল',—এই বলিয়া সাঁ সাঁ করিয়া কাঁদে।

ও ঘরে সুমতির মনে হয়, এতক্ষণে তাহার সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি আসিয়াছে। পৃথিবীর মত খারাপ গ্রহ সৌরজগতে যে আর নাই একথা টের পাইবার পর আর জাগিয়া থাকা চলে না। এবার ঘুমানো দরকার।

কিন্তু সুমতি ঘুমোয় না। সন্তর্পণে দুয়ার খুলিয়া খোলা বারান্দায় দাঁড়ায়। দেখিতে পায়, নীচে অন্ধকার উঠানে নন্দর ঘরের জানালা দিয়া আলো আসিয়া পড়িয়াছে।

সুমতির ইচ্ছা হয় ওই আলোয় কিছুক্ষণ সে দাঁড়াইয়া থাকে। অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ওই আলোর দিকে চাহিয়া না থাকিয়া ওই আলোয় দাঁড়াইয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ত্থাখে।

নন্দ—অক্ষয়ের কম্পাউণ্ডার। অক্ষয়ের কম্পাউণ্ডার আছে দু'জন। তিন বছর মেডিকেল কলেজে পড়িয়াছিল বলিয়া তাহাদের মধ্যে নন্দর মানও বেশী, মাহিনাও বেশী।

সে অক্ষয়ের বাড়ীতেই থাকে ও খায়। কোন প্রয়োজন না থাকিলেও ভোর পাঁচটায় উঠিয়া ডিসপেনসারীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। ঘরের ভিতর তখন আলো অন্ধকারের মেশামেশি।

খাবারি ও খাবার জল পৌছাইয়া দিতে ঘরে ঢুকিতে গিয়া সুমতির

গা একটু ছম ছম করে। সকলের ঘুমের আড়ালে এই কর্ত্তব্য পালনে কেমন যেন গোপন অভিসারের আমেজ আছে, অনুভূতির মধ্যে সেটুকু ধরা পড়া কোন মতে নিবারণ করা যায় না।

নন্দর যত কাব্যও কি এই ভোরকে নিয়াই!

'কাল ঘুম আস্‌তে একটা বেজে গিয়েছিল, সুমতি। তবু এত ভোরে উঠলাম। হয়ত আজ এখন দোকানে যাব না। তুমি চলে গেলে আবার ঘুমিয়ে পড়ব।'—বলিয়া নন্দ হাসে।

সুমতি রাগ করিয়া বলে, 'আজ থেকে রাত্রেই আপনার ঘরে খাবার রেখে যাব। ভোরে ওঠার কষ্ট পেয়ে কাজ নেই।'

নন্দ তথাপি হাসে—'তাতে আমার ঘরের রাত-অতিথি ইঁদুরগুলিরই উপকার হবে আর কিছু হবে না। আমি ক্ষুধার্ত্ত হয়েই দোকানে যাব।'

'তাতে আমার ক্ষতিটা কি?'

কথাটা বলিয়াই নিজের বোকামিতে সুমতির মন অনুশোচনায় ভরিয়া যায়, সবটুকু রাগ নিজের উপরে গিয়াই পড়ে। ফাজলামি করিবার এমন সুযোগ অবহেলা করিবে নন্দর কি সে উদারতা আছে? কথাটা বলা তাহার কোন মতেই উচিত হয় নাই।

নন্দর সত্যই উদারতা নাই, সকৌতুকে হাসিয়া সে জবাব দেয়, 'সত্যি কোন ক্ষতি নেই? তবু যদি শেষরাত্রে উঠলেও খাবার হাতে হাজির না হতে!'

'আমি রোজ এমনি সময় উঠি।'

'ওঠই তো! কে তা অস্বীকার করছে? কেন ওঠ তাই নিয়ে প্রশ্ন।'

কথায় নন্দর সঙ্গে পারিবার যো নাই। সুমতি মুখ গোঁজ করিয়া বাহির হইয়া আসে। দুপুরে নন্দ খাইতে আসিলে সামনে বসিয়া খাওয়ায় না। রাত্রে এক ফাঁকে ঘরে খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া আসে।

ইঁদুরের কথাটা সে ভোলে না। ঢাকনির উপর একটা দশসেরি শিল চাপাইয়া দেয়। রান্নাঘর হইতে শিলটা নন্দর ঘরে বহিয়া নিয়া যাইতে তাহার যে রীতিমত কষ্ট হয় একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চাকরকে বলিলে সে অবশ্য কাজটা করিয়া দিতে পারে, কিন্তু চাকরকে সুমতি বলে না। নন্দর সঙ্গে তাহার কলহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে চাকরকে টানিতে তাহার ইচ্ছা হয় না।

পরদিন সকালে খাবারের খবর নিতে গিয়া ত্যাখে অমন ভারি শিলটা সরাইয়া ঢাকনি উল্টাইয়া ঘরময় খাবার ছড়াইয়া রাতারাতি ইঁদুরে কল্পনাতীত অত্যাচার করিয়া গিয়াছে! ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া সুমতি হাসিবে না কাঁদিবে ভাবিয়া পায় না। কি ছেলেমানুষ নন্দ! কি করিয়া রাগের জবাব দিতে হয় আজও তা শেখে নাই। ঘরময় মিনতি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে,—আমায় প্রশ্রয় দিও করুণাময়ী!

অথচ এ যেন খাপ খায় না, এ যেন অর্থহীন। সুমতির চোখে সহসা জল আসিয়া পড়ে। ঘরের কোণে ওই রঙচটা তোবঙ্গ, দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝোলানো আধ ময়লা একটা পাঞ্জাবী, তক্তপোষে পুরাণো তোষকের বিছানা আর বালিশের পাশে ওই এক তাড়া মনিঅর্ডারের রসিদ—ছড়ানো খাবারগুলির সঙ্গে এই সবের সামঞ্জস্য নাই যে একেবারেই। সুমতির মনে হয় বজ্রের মত কঠোর ফুলের মত কোমল এই লোকটি যে তাহার জীবনে পদার্পণ করিয়াছে তার মধ্যে প্রচুর অমঙ্গলের সম্ভাবনা লুকানো আছে, ইহাকে তাহার ভয় করিয়া চলা উচিত। এ একদিন তাহাকে বিপন্ন করিবে।

নন্দর প্রকৃতির গভীর দিকটার সঙ্গে সুমতির পরিচয় বেশী দিনের নয়।

এক সপ্তাহও হয় নাই একদিন ভোরবেলা খাবারের বাটি ও জলের গ্লাসটা টেবিলের উপর ঠক্ করিয়া নামাইয়া দিয়া সে বাহির হইয়া যাইতেছিল, ফস করিয়া সুইচ্ টিপিয়া নন্দ আলো জ্বালিল।

সুমতি চমকাইয়া বলিল, 'ইস্! এ আবার কি?'

'একটা কথা আছে সুমতি। আলো না জ্বাললে তো তুমি দাঁড়াবে না। অথচ একটা ভয়ানক দরকারী কথা তোমাকে এখন না বললেই নয়।'

এ ভূমিকা সুমতি চিনিত। নন্দর বক্তব্য অনুমান করিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে বলিল 'পাঁচটা টাকা চাই, এই ত কথা?'

নন্দ অবাক হইয়া বলিল, 'কি করে জানলে?'

যেন জানাটা সুমতির পক্ষে আশ্চর্য্য ব্যাপার। নন্দর যে দু'টার বেশী জামা নাই, ক্রমাগত তালি লাগাইয়া এক জোড়া জুতাই সে যে আজ একবৎসর ব্যবহার করিতেছে, মাসের দশ দিন না কাটিতে জলখাবারের কটা পয়সাও যে তাহার হাতে থাকে না, এসব যেন সুমতির অজানা!

'যেমন করেই জানি, টাকা চাই কিনা বলুন!'

'চাই।'

'দিচ্ছি এনে। কিন্তু মাইনের টাকাগুলো কি করলেন?'

নন্দর চোখ দুটি সহসা স্তিমিত হইয়া গেল।—'জুয়া খেলেছি।'

'ষাট টাকা জুয়া খেললেন?'

'না, পঞ্চাশ। দশ টাকা একজন ধার নিয়েছে।'

সুমতি গম্ভীর হইয়া বলিল 'শেষটা সত্যি হতে পারে, প্রথমটা খাঁটি মিথ্যা।'

'মিথ্যা নয়। রূপক।'

'রূপক না ছাই!' বলিয়া সুমতি বালিশের তলা হইতে মনিঅর্ডারের রসিদের তাড়াটা টানিয়া বাহির করিল। বলিল 'কেদার মুখুয্যেকে আপনি প্রত্যেক মাসে পঞ্চাশ টাকা পাঠান। মুখুয্যেটি কে?'

নন্দ সংক্ষেপে জবাব দিল, 'ভগ্নীপতি।'

'আমিও ওই রকম একটা কিছু অনুমান করেছিলাম। কিন্তু এতো ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার। সীতা থাকে আপনার কাকার কাছে, মাসে মাসে মাইনের সব টাকাগুলি আপনি পাঠিয়ে দেন ভগ্নীপতিকে। পণে'র টাকা শোধ হচ্ছে নাকি? শোধ না হলে সীতা স্বামীর ঘর করতে পাবে না?'

'না। সীতাকে যে স্বামীর ঘর করতে হয় না ও তার দাম সুমতি।'

ইহার পর নন্দ সব কথা খোলসা করিয়াই বলিয়াছিল। কেদার মুখুয্যে ছিল নন্দর পিতৃবন্ধু—নেশার বন্ধু;—মদের। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর নন্দর বাবার মাথাটাও বোধ হয় একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আর কোন যোগাযোগ ঘটিয়াছিল কিনা এখন আর জানিবার উপায় নাই, জানিয়া লাভও নাই। কেদারের সঙ্গে হঠাৎ একদিন সীতার বিবাহ হইয়া গেল।

নন্দ কিছুই জানিত না। যে রাত্রে সীতার বিবাহ হয় সে রাত্রে কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে সে মহানন্দে থিয়েটার দেখিতেছে।

'জানো সুমতি, ওদিকে সীতাহরণ হচ্ছে, আর আমি দেখেছি থিয়েটার। থিয়েটার!—শিশির ভাদুড়ীর সীতা প্লে দেখেছি।'

কাহিনী শুনিয়া সুমতি অনেকক্ষণ নীরব হইয়া ছিল। শেষে আস্তে

আস্তে একটা অতি ছেলেমানুষী প্রশ্ন করিয়াছিল, 'সীতাকে আপনি খুব ভাল বাসেন, না?'

নন্দ সহজ ভাবেই ইহার জবাব দিয়াছিল 'বাসি। কিন্তু একটি মাত্র বোনের অমন অবস্থা হলে কোন ভাই তা সইতে পারে না। সিঁথীর লাল ঘায়ের যন্ত্রণায় সীতার ছটফটানি তুমি যদি দেখতে সুমতি!'

সিঁথীতে লাল ঘা! কি বর্ণনা! সুমতি আর কথা কহিতে পারে নাই। অথচ তাহার অনেক বক্তব্যই ছিল। স্বামী বৃদ্ধ হোক মাতাল হোক হিন্দু মেয়ের স্বামীর ঘর না করিয়া কেমন করিয়া চলে নন্দকে একথাটা সে জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়া ছিল। বৃদ্ধ মাতাল স্বামীও যে স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসিতে পারে, অন্তত বিবাহের পর কয়েকটা বছর; মাতাল স্বামীর ছেলেমেয়ে নিয়াও যে একটা নারী-জীবন এক দিক দিয়া সার্থক হইতে পারে এই ধরনের কয়েকটা কথা আভাষে ইঙ্গিতে নন্দকে জানাইয়া দিবে কিনা মনে মনে সুমতি নাড়া চাড়া করিয়া দেখিতেছিল।

কিন্তু সীতার সিঁথীর বর্ণনা শুনিয়া কিছু বলিতে তাহাকে ভরসা হয় নাই। নিজের সিঁথী তাহার বড় বেশী সাদা হইয়া গিয়াছে।

পরদিন সকালেই সুমতি খাবার নিয়া আসে।

নন্দ সঙ্গে সঙ্গে অভদ্র রকমের খুসী হইয়া উঠে। হাসিয়া বলে 'আঃ, খাবারে আজ ক্ষমার অমৃত। দোকানে গিয়া খানিকটা সায়ানাইড় খেয়ে দেখব মরি কিনা।'

'খাবেন না, মরবেন। এ ক্ষমা নয়। দয়া।

নন্দর মুখ ঘনাইয়া আসে—'দয়া?'

'তবে কি ভাবেন আপনি?'

দু'জনের উদ্ধত দৃষ্টি নীরবে খানিকক্ষণ কলহ করে।

সহসা বাটিটা তুলিয়া নিয়া নন্দ মেঝের উপর আছড়াইয়া ফ্যালে। আঙুল বাড়াইয়া খোলা দরজাটা দেখাইয়া চাপা গলায় বলে 'যাও। দয়াবতী দয়া করে যাও।'

ক্ষমা চায় দুপুরে খাইতে আসিয়া। অন্য দিনের চেয়ে একটু সকাল করিয়াই আসে।

হাত জোড় করিয়াই হাসিয়া ফ্যালে। বলে, 'ক্ষমা সুমতি।'

ইহাতে নন্দকে ক্ষমা করিবার সুবিধাই হয়। কারণ সুমতির মুখের দিকে চহিয়া সে আর হাসিতে পারে না। তাহার চোখ দুটি ছল ছল করিতে থাকে।

বলে 'এবারকার মত ক্ষমা করে ফেল সুমতি, সত্যি বলছি আর কোন দিন তোমাকে ঠাট্টা করব না।'

ঠাট্টা! সুমতি গম্ভীর মুখে বলে 'আচ্ছা।'

'না।'

খুসী হইয়া শিস্ দিতে দিতে নন্দ চলিয়া যায়। কি অপরাধে সুমতির কাছে হাত জোড় করিয়া ক্ষমা চাহিতে হইয়াছিল, বাকী দিনটুকুর মধ্যেই সে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়।

রাত্রে সে যখন ফেরে অক্ষয় হয়ত খাইতে বসিয়াছে, অদূরে বসিয়া সুমতি তাহার আহারের তত্ত্বাবধান করিতেছে; খাইতে বসিয়া অক্ষয় কথা বলেনা, কখন কি প্রয়োজন খেয়াল রাখিয়া চাহিয়া নিতে পারেনা, সুতরাং তাহার খাওয়ার উপর সুমতিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখিতে হয়। উঁকি দিয়া দেখিয়া নন্দ নিজের ঘরে চলিয়া যায়। আহারান্তে আঁচাইয়া অক্ষয় উপরে চলিয়া না গেলে সে খাইতে আসেনা।

আসনে বসিয়া বলে 'ওর সঙ্গে কেন খেতে বসি না জান ?'

নন্দর ছলো ছলো চোখদুটির কথা সুমতির মনে ছিল, সে সদয়ভাবে হাসিয়া বলে 'জানি বৈকি। যতই হোক উনি মনিব তো।'

'ওঃ ভারি মনিব ! আর তিনটা বছর পড়লে আমি ওর চেয়ে বড় ডাক্তার হ'তাম এ্যাদ্দিনে, তা জান ? বলতে পারলে না।'

সুমতি একটু ভাবিবার ভাণ করিয়া বলে 'তবে ওঁকে দেখতে পারো না বলে বোধ হয়।'

নন্দ ভাবিয়া বলে 'তাও নয়। ভাগের পূজায় আমার রুচি হয়না বলে।

'ভাগের পূজা ! পূজা ! সুমতির যেন চমক ভাঙ্গে। এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত মুখ তাহার রাগে লাল হইয়া উঠে।

এমনিভাবে দিন কাটে। মনের জোরে যে দূরত্ব সুমতি বজায় রাখিতে পারেনা, বিষাদ ও বেদনার মধ্যে ক্রমে ক্রমে তাহার সৃষ্টি হয়। নিজের দুর্ব্বলতার অপরাধটা ধীরে ধীরে নন্দর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া তাহার উপর একটু বিতৃষ্ণাও সে বোধ করে। নন্দর পরিহাসে আর সে রাগ করেনা, নীরবে উপেক্ষা করিয়া যায়, পরিহাসস্পৃহাও নন্দর সুতরাং আপনা হইতেই কমিয়া আসে।

'জেনে শুনে যত দোষ করেছি সব তুমি ক্ষমা করেছ সুমতি। না জেনে এমন কি দোষ করলাম—'

সুমতি কিছুমাত্র মমতা বোধ করে না। ইহাকে আবার ভাব জমাইবার হীন প্রচেষ্টা মনে করিয়া তাহার গা জ্বলিয়া যায়, রুক্ষ সুরে সে বলে 'আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে কি ?'

নন্দর মন সরল, সে তথাপি হাল্কা সুরে বলে 'আমার শত্রুর অসুবিধা হচ্ছে। তবে খাওয়ার সময় তুমি উপস্থিত থাকনা বলে অসুবিধাই বল দুঃখই বল একটু হচ্ছে।'

'আমার সময় হয় না।'

শেষ পর্য্যন্ত নন্দ রাগিয়া উঠে, বিশ্রী কথা বলে :

'ভালই, ভালই। আমি শুধু কম্পাউণ্ডার যে।'

ইহার একটা কড়া জবাব নন্দ প্রত্যাশা করে কিন্তু সুমতি নীরবে আপনার কাজ করিয়া যায়, সে রাগ করিয়াছে কিনা তাহা পর্য্যন্ত নন্দ অনুমান করিতে পারেনা।

ইহার পর সেও সাবধান হইয়া যায়, হাসি খুসী কম করিয়া গম্ভীর হইয়া থাকে। সুমতিকে জানাইয়া দেয়—'তোমার জন্য নয়, সীতার অসুখ করেছে।'

সুমতি বুঝিয়াও না বোঝার ভাণ করিয়া বলে, 'কিসের? কি বলছেন?'

'আমি যে আজকাল গম্ভীর হয়ে থাকি তার কথা বলছি। তোমার জন্য নয়।'

সুমতি ভাবে, বাঁচিয়া গেলাম। ভাবে, ভগবানের অনেক দয়া তাই মনের গায়েও একটা কলির আঁচড় পড়া নিবারণ করা গেল।

আহ্নিকে বসিয়া সে যেন আবার ভুলিয়া যাওয়া স্বামীকে স্পষ্ট স্মরণ করিতে পারে। জীবন যেন জীবনের সীমা ছাড়াইয়া আলো ও আনন্দ ভরা একটি অভিনব স্বর্গে উঠিয়া যায়।

নন্দ নিজের ঘরে বসিয়া রাত জাগিয়া মনিঅর্ডারের রসিদ গোণে আর সীতাকে চিঠি লেখে। লেখে—

'আর ভাবনা নেই দিদি, শীগগিরই একটা বাড়ী ভাড়া করে তোকে আনাচ্ছি। ঘর সংসারের সব কাজ কিন্তু তোকে করতে হবে। তোর দাদা—গরীব মানুষ, ঝি চাকর রাখতে পারবে না। বুঝলি? তবে তুই যদি খুব জোর বায়না নিস, উঠতে বসতে দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার 'বৌদি

চাই' 'বৌদি চাই' আব্দার করিস তাহলে দেখে- শুনে খুব খাটতে পারে এমন একটা বৌদি তোকে এনে দিতে রাজী আছি।

আচ্ছা, তোর বৌদি যদি ধর বিধবাই হয়—'

অর্থাৎ নন্দ লিখিতে চায় যে সে যদি একটি বিধবা মেয়েকে বিবাহ করে, তাহাকে বৌদি হিসাবে পাওয়া বিষয়ে সীতার মতামত কি, বাক্য যোজনার দোষে জিজ্ঞাসাটা নিজের মৃত্যু বিষয়ক হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সে আর লেখেনা ; হাসিয়া চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

অবশেষে একদিন অলকা মরিয়া গেল। রাত্রি তখন ন'টা।

মরনকে যে কোন সংসারে এমন বিনা আড়ম্বরে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে সুমতির সে অভিজ্ঞতা ছিলনা। শোকের কলরব নাই, বেদনার বাহুল্য নাই, ঘরের আবহাওয়া শুধু অতি মাত্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মনে হয় এবাড়ীর কর্ত্রী যেন আজ মহাপ্রস্থান করে নাই, সুদীর্ঘ কালের জন্য ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মাত্র। ঘুম ভাঙিবার পরেই সকলের এই নীরবতা, অন্য কোন কারণে নয়।

বার কয়েক উঃ আঃ করিয়া দাসদাসী শোকপ্রকাশের অন্ত করিয়াছে। অক্ষয় গম্ভীর মুখে তাহার আরাম কেদারার দুই বাহুতে কনুই ন্যস্ত করিয়া বসিয়া আছে। কয়েকবার অশ্রু মার্জ্জনা করিতে সুমতির নিজের চোখের জলও গিয়াছে ফুরাইয়া। নন্দ কোথায় যেন গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া শুষ্কমুখে একপাশে দাঁড়াইয়া আছে।

খাটের উপর চাদর ঢাকা অলকার মৃতদেহ।

নীচে ঝির কাছে খোকা কাঁদিতেছিল, সুমতির মনে হইতেছিল, খোকার কান্নার শব্দটুকু শুধু ভিতরে নিয়া সে কানে ছিপি আঁটিয়া

দিয়াছে, ঘরের অস্বাভাবিক স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কেহ যদি মড়া কান্নাও কাঁদিয়া ওঠে সে শুনিতে পাইবে না।

কিন্তু মড়া কান্না কাঁদিবে কে? সে? সে আর সবই পারে, নিজের কান্নায় শব্দ যোজনা করিতে পারে না। নন্দর কথা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। মুখখানা তাহার আজ একটু অতিরিক্ত শুকনো মনে হইতেছে বটে, কিন্তু সুমতি শপথ করিয়া বলিতে পারে তাহার কারণ অলকার উপস্থিত মরণ নয়, অনুপস্থিত আঘাত অথবা দুশ্চিন্তা।

ঘরে ঢুকিবার পর ঠিক কতক্ষণ সময় নন্দ সাতার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল জানিবার জন্য সহসা সুমতির মন কেমন করিয়া উঠিল।

মানুষের মরণ বাঁচন যাহার ব্যবসা, ঔষধ ও আশ্বাস নিয়া যাহার দোকানদারী কান্না তাহার একেবারেই সাজে না। তবু অক্ষয়ের আরামকেদারার সন্নিকটে একটি তেপায়ার উপর রক্ষিত মোটামোটা বইগুলির দিকে চাহিয়া সুমতির বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বইগুলির নৈকট্য সম্বন্ধে অক্ষয় যে কি করিয়া এমন উদাসীন হইয়া আছে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাই সুমতির বার বার মনে পড়িতে লাগিল। অক্ষয় যে বইগুলি দেখিতে পায় নাই সুমতি কোনমতেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

অক্ষয় সুমতির দৃষ্টিকে অনুসরণ করিতেছিল। হঠাৎ সে বলিল 'খোকা অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে, সুমতি। ওকে নিয়ে এসো।'

সুমতি নীরবে চলিয়া গেল। খোকাকে নিয়া ফিরিয়া আসিয়া অবাক হইয়া দেখিল তেপায়ার উপর হইতে বইগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে।

নন্দর কাছে সরিয়া গিয়া সুমতি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখান থেকে বই সরালে কে?'

নন্দ বলিল 'আমি। ডাক্তারবাবু ওঘরে রেখে আসতে বললেন।'

সুমতির মুখ পাংশু হইয়া গেল।

'ভয় করছে নাকি সুমতি ?'

'ভয় ? কিসের ভয় ?'—বলিয়া সুমতি সরিয়া গেল। ভয়! অলকার মরণে তাঁহার ভয় ! মৃত্যুর সঙ্গে এ যেন তাহার প্রথম পরিচয়। সর্ব্বাঙ্গে সে যে একজনের মরণের চিহ্ন ধারণ করিয়া আছে নন্দ কি তাহা দেখিতে পায় না ?

কাঁদিয়া কাঁদিয়া খোকা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, না বুঝিয়া সেই অনেকক্ষণ মার মরণের মান রাখিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িল। অক্ষয় বলিল 'খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে সুমতি, ওকে শুইয়ে দিয়ে এসো।'

খোকার উপর আজ যেন তাহার দরদের সীমা নাই।

খোকাকে শোয়াইয়া দিয়া আসিয়া সুমতি দেখিল এবার স্বয়ং নন্দ অন্তর্হিত হইয়াছে।

'নন্দ লোক ডাকতে গিয়েছে সুমতি।'

সুমতি প্রশ্ন করে নাই, আপনা হইতে বলিল বলিয়া অক্ষয়ের কথাটা একটু যেন কৈফিয়তের মতই শোনাইল।

সুমতি বলিল 'ও।'

'ওকে শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে তোমায় একটা কথা বল্‌তে চাই সুমতি।'

অলকার শবকে শোনাইয়া তাহাকে অক্ষয়ের কি বলিবার থাকিতে পারে সুমতি ভাবিয়া পাইল না। ভয়ে বিবর্ণ হইয়া বলিল 'কি কথা ?'

অক্ষয়ের স্বর অচঞ্চল, মুখের ভাব নির্ব্বিকার। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সে যেন সাক্ষ্য দিতেছে।

'ও যে বাঁচবে না, প্রথম থেকেই আমি তা জানতাম সুমতি।'

'জানতেন! না না, জানতেন না।'

'কিন্তু ওকে বাঁচাবার চেষ্টা যে আমি প্রাণপণেই করেছি, তুমি তার

অক্ষয় এতক্ষণ সোজা হইয়া বসিয়া ছিল, এইবার আরাম কেদারায় ঠেস দিল।

যত নিঃশব্দেই চুকিয়া গিয়া থাক অলকার মরণ যে তুচ্ছ হইয়া নাই বুঝিতে কাহারো বাকী রহিল না।

সেদিন রাত্রে মুমূর্ষুর ঘরের আবহাওয়ায় যে অস্বাভাবিক স্তব্ধতা দেখা গিয়াছিল সমস্ত বাড়ীতে তাহা যেন ব্যাপ্তি নিয়াছে।

অক্ষয় বাহিরে যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। রোগী অন্য ডাক্তার সংগ্রহ করে, অক্ষয় নিজের ঘরে খোকাকে নিয়া দিন কাটায়। ইজি চেয়ারটা সে এ ঘরে আনাইয়া নিয়াছে।

বলে, 'আলস্য নয় সুমতি, এ আমার বিশ্রাম। আর কিছুদিন ওভাবে চললে মারা পড়তাম।'

সুমতি কিছুই বলে না। নীরবে খোকাকে দুধ খাওয়ায়।

এঘরে অলকার স্মৃতির আমেজটুকুও নাই। কবে যে সে এ ঘরে আসিত, আলমারি খুলিয়া গুছানো জামা কাপড়গুলি মেঝেতে নামাইয়া আবার গুছাইয়া তুলিত, বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল বাঁধা শেষ হইলে হাই তুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া হাসিত, অক্ষয়ের বিশ্বাস, সে তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে।

সুমতি কেন যে ঘরের সর্ব্বত্র অলকার অবলুপ্ত স্মৃতি আবিষ্কারের চেষ্টা করে অক্ষয় তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

বাহিরে ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, ঘরের বাতাস ভিজিয়া ভারি, আলো ম্লান। খোকাকে নিতে গিয়া কেমন করিয়া সুমতির হাতশুদ্ধ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য চাপিয়া ধরিয়াছিল অক্ষয় জানে না। ইচ্ছা করিয়া যে নয় সুমতি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়াই অক্ষয়ের অনুমান। তথাপি কয়েক মিনিট পরেই আলমারির উপরের তাকে লুকানো একতাড়া চিঠি সে খুঁজিয়া পাইল।

অলকাকে লেখা অক্ষয়ের প্রেমপত্র। একখানা নয় দু'খানা নয় পঁচিশ ত্রিশখানা। সে যেন রঙিন সুতায় বাঁধা একরাশি পুরাতন, ব্যবহৃত, বিবর্ণ প্রেম!

আজ নিশ্চয় নয়। কবে যেন সুমতি চিঠিগুলি খুঁজিয়া পাইয়াছিল। নহিলে সোজা আলমারি খুলিয়া ভাঁজ করা শীতের পোষাক গুলির পিছনটা এখন সে হাতড়াইবে কেন?

চিঠির তাড়াটা নিয়া গম্ভীর হইয়া অক্ষয় বলিল, 'মরা মানুষের জন্য শোক করা কর্ত্তব্য, একথা তুমিও জান আমিও জানি।'

সুমতি কিছুই বলিল না।

'কিন্তু তার অত্যাচারটাও স্বীকার ক'রে নেওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে আমার রীতিমত সন্দেহ আছে সুমতি।'

এবারেও সুমতি নীরব হইল।

'ওটা ভূতের উপদ্রবেরই সামিল। আত্মীয় পর কোন ভূতের উপদ্রব গ্রাহ্য করা উচিত কি? সে কত বড় ভীরুতার লক্ষণ বলত!'

এ যেন বিশেষ করিয়া তাহাকেই তিরস্কার করা। বড় আয়নার মধ্যে নিজের বিধবা বেশ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, চাহিয়া দেখিয়া সুমতির চোখে জল আসিল।

মাঝে মাঝে স্থগিত হইতে লাগিল বটে কিন্তু বৃষ্টি একেবারে কমিল

না। দিনগুলি রুক্ষ হইয়া উঠিতে উঠিতে আবার জলে ভিজিয়া যাইতেছে, এ বাদল আশীর্ব্বাদের মতই। কিন্তু সুমতির ভাল লাগিতেছিল না। দ্বিপ্রহরে খোকাকে কোলে নিয়া নিজের ঘরে সে বসিয়াছিল, সকাল হইতে যে স্তিমিত বেদনা পীড়া দিতেছিল এখন তাহা গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। নন্দ আজ সারাদিন খায় নাই। দোকান হইতে সকাল সকাল ফিরিয়া সেই যে সে শুইয়াছিল আর ওঠে নাই। ডাকিতে গিয়া সুমতি শুনিয়াছিল তাহার শরীর ভাল নয়, সে খাইবে না। শরীরের কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিয়া জবাব মেলে নাই।

অথচ কোথায় যে তাহার অপরাধ সুমতি ভাবিয়া পাইতেছিল না। তাহার বয়স তেইশ, সে যুবতী সে সুন্দরী তাহার স্বামী নাই ইহা যদি সকলে তাহার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে, এবার তাহার মরাই ভাল। কিন্তু কিছুই তো সে করে নাই! প্রাণপণে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিবার চেষ্টায় কবে তাহার ত্রুটি ঘটিয়াছে? তাহাকে নিয়া নন্দর অনধিকার চর্চ্চায় শুধু ততটুকু রাগই সে করিয়াছে যতটুকু রাগ না হইলে মানায় না, সে রাগের জের টানিয়া চলিবার চেষ্টাও সে করে নাই। সকলের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সহজ ও সাধারণ করিয়া রাখিতে সারাদিন ব্যাপৃত থাকিয়াছে।

অথচ ইহাদের কল্যাণে জীবন তাহার আজ অকথ্য জটিলতায় ভরা। সব বিষয়ে সেই হইয়া উঠিতেছে অপরাধী।

সীতার দুর্ভাগ্য উপলক্ষে ষাট টাকার কম্পাউণ্ডারি করাই যে নন্দ জীবনের চরম লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছে সে অপরাধ তাহারই। এক সাহেবের প্রকাণ্ড ওষুধের দোকানে একশ দশ টাকার চাকরীটা যে নন্দ পছন্দ করিল না সে জন্য সুমতি ভিন্ন আর কেহ দোষী নয়। স্বাস্থ্য যে নন্দর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে সে দায়িত্বও সুমতির।

অলকা যে বাঁচিল না, মরিয়াও স্বামীর দু'ফোঁটা চোখের জলের তর্পণ পাইল না, এ জন্য স্বয়ং ভগবানও হয়ত একদিন সুমতিরই বিচার করিবেন।

এমনি সব কটু চিন্তায় সুমতি ব্যাপৃত ছিল, ও ঘর হইতে অক্ষয় তাহাকে আহ্বান করিল। অনুযোগ করিয়া বলিল 'একা একা দুপুরটা যে কাটে না সুমতি।'

সুমতি মৃদুস্বরে বলিল 'খোকাকে রেখে যাব ?'

'খোকার সঙ্গে এক তরফা আলাপ করব কতক্ষণ ? তাছাড়া দুপুর বেলা আর রাত্রিটা তোমার কোল দখল করে থাকা ওর অভ্যাস, আমার কাছে কাঁদবে।'

সুমতি নতমুখে বলিল 'কিন্তু দুপুরে একটু না শুয়ে যে আমি পারব না। কাল একাদশী করেছি।

অক্ষয় ব্যস্ত হইয়া বলিল 'ও, আচ্ছা, তবে তুমি যাও সুমতি, শোবে যাও। কাল তোমার একাদশী গেছে জানতাম না। তুমি বুঝি নির্জ্জলা একাদশী কর ?'

সুমতি নীরবে স্বীকার করিল। অক্ষয়ের আর কিছু বলিবার আছে কিনা ক্ষণকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া সে নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। তাহার মনে পড়িল নন্দও একদিন নির্জ্জলা একাদশীর কথাটা তুলিয়াছিল। কিন্তু অক্ষয়ের মত এমন ভদ্র ও সংযতভাবে নয়। সে নির্জ্জলা একাদশী করে শুনিবামাত্র একটুকরা কাগজ টানিয়া নিয়া মোটা মোটা হরফে লিখিয়াছিল 'নির্জ্জলা', তারপর কাগজটা সামনে ধরিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল 'হঠাৎ দেখলে কথাটাকে 'নির্ল্লজ্জ' মনে হয় না ? হয়, কি বল ? বলই না ছাই হয় কি না হয়, তাতে আর তোমার এমন কিছু মহাপাপ হবে না।'

বিছানায় শুইয়া সুমতির মনে হইল অক্ষয়ের ভদ্রতার চেয়ে নন্দর সেই অসংযত হাসিতে যেন কুটিলতা কম ছিল। নন্দর বিশ্রী মন্তব্যটার মধ্যেই যেন সহানুভূতি ছিল বেশী।

বিকালের দিকে বৃষ্টি কমিয়া গেল। অনেক ভাবিয়া সুমতি নন্দর খবর নিতে গেল। বলিল 'উপোস করছেন কেন?'

নন্দ সবগুলি জানালা বন্ধ করিয়াছে, ঘরের ভিতরটা ভোরবেলার মতই আবছা।

'আমার জ্বর হয়েছে।'

'বেশী জ্বর?'

'কপালে হাত দিলেই টের পাবে জ্বর বেশী কি কম।'

কপালে হাত দিতে সুমতির সাহস হইল না। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল 'একটু দুধ খান্।'

নন্দ ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

'সমস্ত বাড়ীতে পচা ঘিয়ের গন্ধ, লুচি ভাজছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'নিয়ে এসো খানকত লুচি, লুচিই খাব।'

'জ্বরের মধ্যে লুচি খাওয়া কি ঠিক হবে?'

নন্দ হাসিল।

'কপালে হাত দিয়ে যে জ্বর দেখতে পারে না তার সে ভাবনা কেন?'

ইহার জবাব অবশ্য সুমতি দিতে পারিল না, কিন্তু লুচিও সে নন্দকে খাইতে দিল না। এক বাটি গরম দুধ আনিয়া কড়া সুরে বলিল 'খান, ছেলেমানুষী করবেন না।'

কি মনে করিয়া নন্দ আর গোলমাল না করিয়া দুধ খাইল।

রাত্রে আবার দুধ খাইবার পালা। অন্ধকার গাঢ় বলিয়া এখন আর আলো জ্বালিতে কোন বাধা নাই।

আলো জ্বালিয়াই সুমতির চমক লাগিল। নন্দর 'অভূতপূর্ব্ব ভাবপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। চেয়ারে বসিয়া সে একটা পা টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়াছে, দুই হাতের দশটা আঙ্গুলে টেবিল ঠুকিয়া অত্যন্ত জলদ একটা ধ্বনি তুলিয়া তাহারি তালে তালে মাথা নাড়িতেছে। রুক্ষ বিশৃঙ্খল চুলের মধ্যে ঢেউ খেলিয়া যায়, কপালের একটা শ্রীহীন কুঞ্চনের বারংবার লয় ও আবির্ভাব ঘটে, মুখখানি অস্বাভাবিক পাণ্ডুর ও নিষ্প্রভ মনে হয়।

সুমতি ভীত হইয়া উঠিল। 'কি হয়েছে ? কি হয়েছে আপনার ?'

পা নামাইয়া নন্দ সোজা হইয়া বসিল। চোখ খুলিতেই বোঝা গেল দু'চোখ তাহার জবা-ফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে।

অথচ কথা সে কহিল রসিকতা করিয়া :

'আমার প্রবল আনন্দ হয়েছে সুমতি।'

আনন্দই বটে! বিবর্ণ মুখে সুমতি বলিল 'কেন ? কেন আপনার এমন আনন্দ হ'ল ?'

'পড়'—নন্দ একটা দুমড়ানো পত্র সুমতির হাতে গুঁজিয়া দিল। সুমতি পড়িল। নন্দর কাকার পত্র। সংবাদ সংক্ষিপ্ত। বিগত সতরই শ্রাবণ সীতার বৈধব্য ঘটিয়াছে। নৌকা করিয়া কেদার গ্রামান্তরে যাইতেছিল। নৌকাতেই সে প্রাণ ভরিয়া মদ খায়। সুতরাং বর্ষার নদীতে টলিয়া গিয়া আর উঠিতে পারে নাই।

কেমন করিয়া কেদার নদীর মধ্যে টলিয়া পড়িয়াছিল চিঠিতে সে কথা লেখা নাই।

সুমতি বহুক্ষণ মুখ তুলিতে পারিল না। শুষ্ক চোখ দেখিয়া নন্দ

কি ভাবিবে কে জানে! নন্দর মধ্যস্থতায় অচেনা সীতার জন্য সুমতি সত্যই একটু একটু মমতা বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা দুফোঁটা চোখের জল ফ্যালে। কিন্তু অশ্রু আজ দুর্লভ। জীবনটা সম্প্রতি নানাবিধ নাটকীয় উপাদানে এমনি অভিনব হইয়া উঠিয়াছে যে চোখে জল আনা আর সহজ নয়।

মণিঅর্ডারের রসিদগুলি খাঁচা-ছাড়া পাখীর মত সর্‌সর্‌ করিয়া ঘরময় উড়িয়া বেড়াইতেছিল, সুমতির গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নন্দ বলিল 'জান সুমতি, উত্তেজনায় আমার যে জ্বর এল সে শুধু মুক্তির আনন্দ নয়। নিজেকে খুনী বলে জানলে—'

'খুনী কি গো?' সুমতি ভয়ানক চমকাইয়া উঠিল।

'না না, চমকাবার কিছু নেই সুমতি। সে খুনের কথা বলছিনা। তিন বছর ধরে মনে মনে যে কেদারের মারণ যজ্ঞ করেছিলাম সে তো আর অস্বীকার করবার উপায় নেই, তাই কেবলি মনে হচ্ছে সে লোক যে অপঘাতে মরল তার দায়িত্বটা আমারই। ইবসেনের একটা নাটকে—আচ্ছা, থাক ইব্‌সেনের কথা।'

সুমতি চুপ করিয়া রহিল।

'শরীরটা এমন দুর্ব্বল মনে হচ্ছে। যেন কতকাল রোগে ভুগেছি।'

সুমতি তথাপি চুপ করিয়া রহিল।

নন্দ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল 'বিশ্বাস করছ না? কিন্তু সত্যি এরকম হয়। A sudden shock to the mind and its subsequent disturbances may result in severe physical sickness. কেন হয় তাও বলছি শোন। আনন্দ ব্যথা ভয় এই সব উত্তেজনা মনে দেখা দিলেই শরীরের অনেকগুলি গ্ল্যাণ্ড থেকে রসস্রাব সুরু হয়। আনন্দ কম আর স্বাভাবিক হলে যে রস বার হয় শরীরের তাতে উপকার হয়,

কিন্তু অস্বাভাবিক প্রবল আনন্দের রস ঠিক বিষের মত কাজ করে, ঠিক—'

'চুপ করুন।'

বলিতে বলিতে নন্দ বেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছিল, থতমত খাইয়া চুপ করিল। তারপর হঠাৎ রাগ করিয়া বলিল 'অক্ষয় বাবুকেই জিজ্ঞাসা কোরো কথাগুলি সত্যি কি মিথ্যা। তিন বছর ওমনি মেডিকেল কলেজে পড়িনি সুমতি, কিছু কিছু সবই জানি।'

'আচ্ছা! দুধটা খেয়ে ফেলুন।'

নন্দ মুখ ভার করিয়া দুধ খাইয়া বলিল 'এবার কি করতে হবে? লক্ষ্মী ছেলের মত ঘুমোব? না ক খ শিখব?'

'আপনার খুসী' বলিয়া সুমতি চলিয়া যাইতেছিল, নন্দ ডাকিয়া ফিরাইল।

'চলে যাও যে? আমায় ঘুম পাড়িয়ে যাও। আমার আনন্দে বৈচিত্র্য দিয়ে যাও ভাল চাও ত', নইলে রাতারাতি হার্টফেল করব।'

সুমতি উদ্ধতভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইল কিন্তু যে জবাব সে দিতে চাহিয়াছিল নন্দর মুখ দেখিয়া তাহা আর মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না। শান্ত কণ্ঠেই বলিল 'কি করতে হবে বলুন।'

নন্দ আঙ্গুল বাড়াইয়া বিছানাটা দেখাইয়া বলিল, 'বালিশ সরিয়ে বিছানায় বোস, তোমার কোলে মাথা দিয়ে আমি শোব। ব্যস্, আর কিছু না। আমি ঘুমিয়ে পড়লে চলে যেও।'

সুমতি বিবেচনা করিয়া দেখিল, নন্দর দাবী যে অসঙ্গত নয় তাহার সপক্ষে যুক্তি আছে। আনন্দে তাহার বৈচিত্র্য না আসিলে রাত্রে সত্যই সে ঘুমাইতে পারিবে না। সমস্ত রাত্রি এই উত্তেজনায় ছটফট করিয়া কাটাইলে আজিকার সামান্য অসুখ কাল বাড়িয়া যাওয়ার

সম্ভাবনা। কিন্তু তাই বলিয়া এতরাত্রে এই উত্তেজিত মানুষটির মাথা কোলে নিয়া ইহার বিছানায় সে বসে কি করিয়া?

ভাবিয়া চিন্তিয়া সুমতি বলিল 'না। বোন বিধবা হয়েছে এই অজুহাতে এতবড় অন্যায় করতে আপনার না বাধুক, আমার বাধবে।'

কথাটার সমস্তটুকুর অর্থ বুঝিতে কয়েক মুহূর্ত্ত সময় নিয়া নন্দ চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল।

'তোমার সঙ্গে আর কোন দিন যদি আমি কথা বলি—আচ্ছা তুমি যাও। আর এক মিনিট দাঁড়ালে তোমায় আমি সত্যি অপমান করে বসব সুমতি। এক্ষুণি তুমি আমার ঘর থেকে চলে যাও।'

সুমতি নীরবে চলিয়া গেল। নন্দ অপমান করিবে বলিয়া নয়, আর দাঁড়াইয়া থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না বলিয়া। নন্দকে জানিতে তো তার বাকী ছিল না। নন্দ ছেলেমানুষী করিতে জানে ভাল করিয়াই, অপমান করিতে শেখে নাই আজও।

উপরে উঠিয়া বারান্দায় পা দিতেই অক্ষয় খপ করিয়া সুমতির হাত ধরিয়া ফেলিল।

'তুমি নন্দর ঘরে ছিলে?'

দুর্বিনীত প্রশ্ন। সুমতি মৃদুস্বরে বলিল 'ছিলাম।'

'কেন ছিলে?'

'নন্দ বাবুর ভগ্নীপতি মারা গেছে খবর এসেছে, খুব অস্থির হয়ে পড়েছে, তাই—'

অক্ষয় তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। বলিল 'কিছু মনে কোরোনা সুমতি।'

সুমতি অল্প একটু মাথা নাড়িয়া বলিল 'না।'

অক্ষয় কৈফিয়ৎ দিল:

'মনটা ভাল নেই সুমতি। খোকা কেঁদে 'কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল আর তুমি ওদিকে গল্পে মেতে আছ ভেবে হঠাৎ কেমন রাগ হয়ে গেল।'

সুমতি বলিল 'খোকা কেঁদেছিল? কই শুনিনি ত।'

'কেঁদেছিল বৈকি। আমি কি তোমায় মিথ্যে বলছি সুমতি?'

অক্ষয় সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। সুমতি ভাবিতে লাগিল সকাল বেলা চিঠির তাড়া খুঁজিয়া পাওয়ার প্রতিক্রিয়াটা যে অক্ষয়ের দিক হইতে প্রতিশোধের রূপ নিয়া আসিবে এ তাহার জানিয়া রাখা উচিত ছিল। নন্দর মত অক্ষয় ছেলেমানুষ নয়। অলকা তাহাকে প্রচুর নারী-অভিজ্ঞতা দিয়া গিয়াছে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক অক্ষয়কে তাহা কাজে লাগাইতেই হয়।

সে রাত্রির অপমানে রাগ করিয়া থাকার সুযোগ নন্দ পাইল না কারণ সুমতি তাহার উত্তেজনার জোরালো প্রতিষেধক দিয়া গেলেও পরদিন তাহার ভালমতেই জ্বর আসিল। মাথা কোলে তুলিয়া না নিলেও সুমতি সারাদিন তাহার মাথায় বরফ দিয়াছিল।

সন্ধ্যার পর অক্ষয় নিজেই ওষুধ দিয়া গেল। সুমতির মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল 'এর মধ্যে বিষ আছে, বুঝলে?'

সুমতিও বোধ হয় সেই প্রকার কিছু অনুমান করিতেছিল, সভয়ে বলিল 'বিষ?'

'হ্যাঁ। ভাল করে দাগ দেখে খাইও।'

সুমতি ছল ছল চোখে বলিল 'বিষ কেন?'

অক্ষয় হঠাৎ হাসিয়া বলিল 'সে তো তোমায় আমি এক কথায় বুঝিয়ে দিতে পারব না। ওর যা অসুখ একমাত্র বিষেই তা সারে।'

'একদাগের বেশী পড়লে মরে যাবে ?'

'না, বেশীরকম নেশা হবে। শিশির সমস্ত ওষুদ খেলেও মরবে না, দিন তিনেক নেশায় অজ্ঞান হয়ে থাকবে বড় জোর। ডাক্তার অনেক মানুষ মারে, কিন্তু ইচ্ছা করে একজনকেও মারে না সুমতি।'

তা নিশ্চয় মারে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি এরূপ মন্তব্য করিবার অধিকার ডাক্তারের জন্মায় ? সুমতির বয়স ত কম হয় নাই যে ইহাকে হেঁয়ালি মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে, কোন জবাব দিবে না! একান্ত অবিচলিত ভাবেই সুমতি বলিল 'তা বৈকি। কর্ত্তব্যের সঙ্গে সব সময় হৃদয়ের যোগ থাকবে তার তো কোন মানে নেই।'

অক্ষয় ভ্রূকুঞ্চিত করিল। সুমতির মুখখানি অনেকক্ষণ নীরবে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল "কিন্তু কোনমতে একটা কর্ত্তব্যের সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ ঘটে গেলেই আর সব কর্ত্তব্য ভুলিয়ে দেয়।'

ইহাও হেঁয়ালি নয়। সুমতি বলিল 'তা দেয়, কিন্তু কোন কর্ত্তব্যের সঙ্গে কার হৃদয়ের যোগাযোগ ঘটেছে অন্য কর্ত্তব্যে অবহেলা দেখেই সব সময় সেটা ধরা যায় না। কর্ত্তব্যের তো ছোট বড় আছে।'

ওষুধের শিশি হাতে আকাশের সন্ধ্যার নীচে উঠানে দাঁড়াইয়া এমন করিয়া আত্মসমর্থন করিতে সুমতির গলা বুজিয়া আসিতেছিল। অথচ এ সমস্ত অক্ষয়কে জানানো প্রয়োজন। হৃদয়ের হিসাব-নিকাশ যে চিরকালের মত সে চুকাইয়া ফেলিয়াছে অক্ষয়কে ইহা বিশ্বাস করাইতে না পারিলে তাহার আর উপায় নাই।

বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা টাকার কাছে হার মানিতে পারে।—একটি

মরণাপন্ন শাঁসালো রোগীর জীবন মরণের ভার নিতে অক্ষয় আপত্তি করে নাই।

রাত বারোটা অবধি তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া অক্ষয় বাড়ী ফিরিতেছিল। দরোয়ান প্রভুর প্রতীক্ষায় ঢুলিতে ঢুলিতে রামায়ণ পাঠ করিতেছিল, সেই অক্ষয়কে দরজা খুলিয়া দিল।

নন্দর ঘরের সামনে দিয়া অন্দরে যাইবার পথ। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, দরজা খোলা। জেলখানার আধ ঘুমন্ত শাস্ত্রীর মত বুকে চিবুক ঠেকাইয়া নন্দ লম্বালম্বি ঘরটা পরিক্রমণ করিতেছিল, গতি অত্যন্ত মন্থর, যে কোন মুহূর্তে ঘুমাইয়া পড়িয়া মেঝের উপর ঢলিয়া পড়া যেন আশ্চর্য্য নয়।

মেঝেতে লাঠি ঠুকিয়া অক্ষয় বলিল.'তুমি যে যাওনি হে?'

নন্দ দাঁড়াইল।

'না, যাইনি।'

'কেন? যাওনি কেন?'

'একটু দরকার ছিল তাই যাইনি। কাল যাব।'

অক্ষয় শুষ্ককণ্ঠে বলিল 'কাল যাবে, কাল!—কাল আমার নতুন কম্পাউণ্ডার আসবে সকালবেলা, সে কোথায় থাকবে শুনি?'

'সে আসবার আগেই আমি যাব অক্ষয়বাবু।'

অক্ষয় বিরক্ত হইয়া বলিল 'আমার মাইনে করা কম্পাউণ্ডার আমায় অক্ষয়বাবু বলে এ আমি পছন্দ করি না নন্দ। চিরকাল ডাক্তারবাবু বলে এসেছ, যাবার আগে আজ অকারণে একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি কোরো না। তা তুমি ঘরের মধ্যে এত রাত্রে পাক খাচ্ছ কেন?'

নন্দ ক্ষীণভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল 'পরিশ্রম করছি। ঘুম আসে না ডাক্তার বাবু।'

'কোথাও যাবার সময় এরকম হয়' বলিয়া অক্ষয় অন্দরের দিকে পা বাড়াইল।

সিঁড়িটা অন্ধকার—নিবিড় জমাট অন্ধকার। অক্ষয়ের চোখ যেন অন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সুইচের অবস্থান জানা সত্ত্বেও আলো সে জ্বালিল না। বরং সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠিয়া অন্ধকারে ক্ষণিক দাঁড়াইয়া রহিল।

অক্ষয়ের ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। দুয়ারের সামনে পূরা পাঁচ মিনিট কাল দাঁড়াইয়া আলোটা চোখে না সহাইয়া সে ঘরে ঢুকিতে পারিল না। কাল যে আহার্য্য আগলাইয়া জাগিয়া বসিয়া থাকে নাই তাহারি কৈফিয়তের মতে খোকাকে বুকের কাছে নিয়া মেঝেতে আঁচল বিছাইয়া সুমতি জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়া আছে।

সিঁড়ি দিয়া নামা, উঠান পার হওয়া এবং নন্দর ঘরের দুয়ারে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সংযত ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢোকা এই তিনটি কাজ করিতে সুমতির এক মিনিটের বেশী সময় লাগে না। অন্ধকারে হোঁচট খাইয়া সে যে একবারও পড়িয়া যায় নাই এইটুকুই আশ্চর্য্য।

ওপরে খোকার চীৎকার শোনা যাইতেছিল, ঘুমের চোখে সুমতি তাহার হাত মাড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে। কান পাতিয়া খোকার কান্না শুনিয়া সুমতি অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। অমন করিয়া দিশেহারা হইবার কোন কারণ ছিল না। খোকার হাত যদি ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে? এতকাল বুকে করিয়া মানুষ করিয়া এমন ভাবে খোকার কাছে বিদায় নিতে হইল তাহার!

নন্দ বলিল 'কি সুমতি, শেষ বিদায় নিতে এলে বুঝি?'

জোরবাতাসে যেমন আকাশের মেঘ কাটিয়া যায় নন্দর মুখের কালো ছায়াটা তেমনি ভাবে কাটিয়া গিয়াছে। পরিষ্কার নীলাকাশে পাশাপাশি দুই টুকরা সাদা মেঘ যেমন সূর্য্যালোকে ঝক-ঝক করে নন্দর চোখ দুটি তাহার সঙ্গে তুলনীয়।

সুমতি ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ঘরময় এত ছেঁড়া কাগজ উড়িতেছে যে মনিঅর্ডারের রসিদগুলি এখনো মেঝেতে ছড়ানো আছে কি না বোঝা যায় না। চৌকীর উপর দড়ি দিয়া বাঁধা বিছানা, জিনিষ বোঝাই তোরঙ্গটা এদিকে হাঁ করিয়া আছে।

সুমতি মৃদুস্বরে বলিল 'না, বিদায় নিতে আসি নি। আপনার সঙ্গে যাওয়াই ঠিক করলাম। সকালে লজ্জা করবে, এখনি বেরিয়ে পড়ি চলুন।'

রাত দুপুরে তাহার এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে নন্দর চমক লাগার কথা। কিন্তু বিস্ময়ের পরিবর্ত্তে তাহার মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল।

'সে হয় না সুমতি?'

সুমতি বিহ্বলের মত বলিল 'হয় না?'

নন্দ মাথা নাড়িল 'না। এতবড় অনুচিত কাজে আমার আর প্রবৃত্তি নেই। কি জান, আমি ভয় পেয়ে গেছি। তাছাড়া, আমার সময় নেই।'

ভয় পাইয়াছে! সময় নাই! সুমতি আগাইয়া গিয়া নন্দর চৌকীতে বসিয়া পড়িল। সম্বৎসর সাধনা করিয়া নন্দর আজ সিদ্ধিলাভের সময় নাই!

বহুকষ্টে সুমতি শান্ত হইয়া রহিল। কি ঘটিয়াছে জানা দরকার। কিছু যে ঘটিয়াছে—ভয়ানক একটা কিছু যে না ঘটিয়াই পারে না সুমতির তাহাতে সংশয় ছিল না। এভাবে হঠাৎ মানুষ বদলায়—

নিজেকেই সে কি এখন চিনিতে পারিতেছে?—কিন্তু অকারণে বদলায় না।

নন্দ আবার বলিল 'রাগ কোরোনা সুমতি, সত্য আমার সময় নেই। আমার এমন বিপদ হয়েছে বলবার নয়। সকাল বেলাই আমার সীতাকে খুঁজতে যেতে হবে—কতদিনে খুঁজে পাব ভগবানই জানেন।'—বলিয়া সে একটু থামিল, 'কিন্তু আজকের জন্যে তুমি যেন লজ্জিত হয়ো না সুমতি। তোমার এই মাঝরাত্রির দুর্ব্বলতা আমি ভুলে যাব। সত্যি, এ আমার মনেও থাকবে না। সীতাকে যদি খুঁজে পাই, সীতা সাবিত্রীর উপাখ্যানের সঙ্গে তোমার কাহিনীও তাকে আমি শোনাব সুমতি।'

বলিতে বলিতে নন্দ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল।

'তাতে তুমি আপত্তি করবে? তোমার জীবন কাহিনী শুনবার অধিকার কি সীতার আর নেই? তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে না?'

নন্দ পায়চারি আরম্ভ করিল। সীতাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেলে তাহার সহিত কথা কহিতে সুমতি যেন অস্বীকার করিয়াছে এমনি ভাবে বলিতে লাগিল 'তুমি কথা না কইলে অভিমানে সে কি করে বসবে কে জানে? ছেলেমানুষ তো, তোমার চেয়ে অনেক ছোট,—ভাল মন্দ বোঝে না। ছেলেটাকেও আমি চিনি সুমতি, কচি মেয়ে ভোলাবার ক্ষমতা তার অসাধারণ। কতকাল ধরে সীতার মন ভাঙ্গছিল কে জানে!

'অন্ততঃ আজ রাত্রির কথা মনে করে তুমি তাকে ক্ষমা করতে পারবে না?'

বলিয়া নন্দ করুণ চোখে সুমতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ওমেলনাইন

একুশ বছর বয়েসের সময় স্নুনীতি নামে একটি প্রায় একুশ বছর বয়সী মেয়ের সঙ্গে প্রমথের কয়েকমাসের জন্য খুব ভালবাসা হয়। সেই তার প্রথম বাস্তব ভালবাসা, স্নুতরাং, ব্যাপারটা তার পক্ষে একটু প্রচণ্ডই হইয়াছিল। বাকী জীবনটা স্নুনীতিকে ভালবাসিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে নিজেকে সে ধন্য জ্ঞান করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় স্নুনীতি নিজের বেলা পাতলা একগাছি চুল আর প্রমথের বেলা জাহাজ-বাঁধা কাছি দিয়া পরস্পরের বাঁধাবাঁধির ব্যবস্থা করায় তৃতীয় এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটামাত্র বাঁধনটা গিয়াছিল ছিঁড়িয়া। প্রমথ বীভৎস রকম বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিল যে স্নুনীতির জীবনে এই তৃতীয় ব্যক্তিটির আবির্ভাব যেন তারই আবির্ভাবের পুনরভিনয় এবং বাঁধাবাঁধির ব্যবস্থাটাও অবিকল একই রকম। তৃতীয় ব্যক্তিটির প্রতি প্রমথ তাই হিংসার লেশটুকুও অনুভব করে নাই। তার বরং মনে হইয়াছিল যে কয়েকমাস পরে নিজের ভালবাসার দড়িতে বেচারীর যে ফাঁসি লাগিবে সে জন্য ওকে তার মায়া করাই উচিত।

এখন, এধরণের দু'চারটা ছেলেমেয়ে সংসারে থাকিবেই একঘেয়ে জীবনযাপনের হাত হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য, ছুটিছাটায় বেড়াইতে যাওয়ার মত মাঝে মাঝে জীবনে যারা প্রেমের বৈচিত্র্য আনে।

টানিয়াই আনে, মন অথবা গায়ের জোরে : অর্থাৎ, কালচার অথবা রূপের আকর্ষণে। এই আকর্ষণে যখন সেই ধরণের ছেলেমেয়েরা সাড়া দেয় বেহিসাবী আত্মসমর্পণ যাদের স্বভাব, তখন হয় একটু মুস্কিল। মিলন তাদের প্রেমকে আরও জোরালো, আরো ঘনীভূত করিয়া দেয় এবং তার পর যথাসময়ে যখন আসে বিচ্ছেদ তখন সামলানো হয় কঠিন। ব্যর্থ প্রেম কিছু নয়, বিরহ শুধু মনের কষ্ট, ও-সমস্তের জন্য মানুষের খুব বেশী আসিয়া যায় না,—ছেলে স্বর্গে গেলে মাকেও তো তা সহিতে হয়। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ানক মনে হয় ট্রাজিডিটা, যখন বুঝিতে পারা যায় যাকে ভালবাসিয়াছিলাম তার হৃদয় হৃদয়ের রীতিনীতি মানে না, আমাকে সরল সহজ ভালমানুষ পাইয়া, আমার প্রথম যৌবনের অমূল্য সম্পদটুকু সে আমাকে ঠকাইয়া গ্রহণ করিয়াছে —শুধু একটু মজা করার জন্য। বিবাহের আগেই সুনীতির সঙ্গে তার যে অন্যায় ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল এই অপরাধটা প্রমথ নিজের বলিয়াই জানিত : ও দোষটা কখনো মেয়েদের হয় না। তার লজ্জা, দুঃখ ও অনুতাপের পরিমাণ দেখিয়া সুনীতি হাসিত।

বলিত তুমি বড় ছেলেমানুষ।

প্রমথ ভাবিত, তার অনুতাপ দেখিয়া মমতার বশে সুনীতি তাকে সান্ত্বনা দিতেছে। তারপর যখন সে জানিতে পারিল চিরদিনের জন্য তাকে জীবনের সাথী করিবার সাধ সুনীতির কোনদিনই ছিল না, তখন সে হইয়া গেল একেবারে স্তম্ভিত। আত্মসম্বরণ করার জন্য সে একেবারে সাড়ে চারশো মাইল তফাতে কিছুদিনের জন্য চলিয়া গেল বটে কিন্তু সেখানেও সময়ে অসময়ে সুনীতির মাথার চুলের ওমিলনাইন তেলের মৃদু গন্ধ অনুভব করিয়া মাথা-ধরা ও গা বমি বমি আরম্ভ হওয়ায় সে আরও বেশী হতভম্ব হইয়া গেল। সাড়ে চারশো মাইল বাতাসে

গন্ধ ভাসিয়া আসিবে এমন ম্যাজিক তো ওমিলনাইন কেশতৈলের নাই! যে বাড়ীতে সে অতিথি হইয়া আছে সে বাড়ীর মেয়েরা ওমিলনাইন তেলের নামও জানে না, সুনীতি ভিন্ন ন'রকম দেশী ও বিলাতি কেশতৈল একত্র মিশাইয়া ব্যবহার করিতে পারার মত টাকা অনেকের থাকিতে পারে কিন্তু সখ কারো আছে কিনা সন্দেহ। সুনীতির সাড়ী, ব্লাউজ, খোঁপা, চালচলন প্রভৃতি অনেক মেয়ে নকল করার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তার কেশতৈলের সুবাসটি চিরদিন হইয়া থাকিয়াছে অননুকরণীয়। সুনীতির আরেকটা নাম ছিল ওমিলনাইন হেয়ার অয়েল।

সুনীতির স্মৃতি যে একটা কেশতৈলের গন্ধ হইয়া রহিল প্রমথের কাছে, এ একধরণের মানসিক বিকার। নারীসংক্রান্ত না হোক এরকম অভিজ্ঞতা অনেকের জীবনেই আছে। বিশেষ কোন কারণ ছাড়াই হঠাৎ দশ-পনের বছর কিম্বা তারও বেশী পুরানো দিনের এক অবর্ণনীয় অনুভূতি দু'একবার 'কে না অনুভব করে জীবনে? পৃথিবীর রূপ, বাতাসের স্পর্শ ও গন্ধ, হৃদয়ের রসানুভূতি সমস্ত মিলিয়া জীবনের বহু পুরাতন ক্ষুদ্র এক অংশকে পুনরায় সৃষ্টি করিয়া দেয়। কচুবনে বৃষ্টি পড়িতে দেখিলে এখনো প্রমথ হইয়া যায় বারো বছরের বালক, বসিয়া থাকে নবাবদের আমলের পুরানো এক সহরে একটা বহুকালের পরিত্যক্ত ভাঙ্গা বাড়ীতে ভাঙ্গা একটা ঘরে ইটের স্তূপের আড়ালে, শোঁকে ঝাঁটি, কুকুরশোঁকা প্রভৃতি বুনোচারার গন্ধ আর অনুভব করে মৃদুবিষাক্ত বাচ্চা একটা সাপের কামড়। সুনীতির স্মৃতি তেমনি পরিপূর্ণ হইয়া আছে ওমিলনাইন তেলের গন্ধে। এখন, সুনীতির সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার চার বছর পরে সুনীতির স্মৃতি আর সবদিক দিয়াই

প্রায় প্রমথের কাছে মূল্যহীন হইয়া গিয়াছে, শুধু একটা গভীর অবসন্নতা ও মেয়েদের প্রতি একটা গভীরতর বিতৃষ্ণা অনুভব করিতে করিতে ওমিলনাইন তেলের গন্ধ শুঁকিবার জন্য সুনীতিকে সে মনে করে।

এতকাল পরেও মেয়েদের প্রতি প্রমথের এই বিতৃষ্ণার ভাব বজায় থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। মানুষের প্রকৃতিগত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি তার এই ভাবটা বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। সুনীতির কাছে তার দেহ-মন একদিন যে ভীষণ আঘাত পাইয়াছিল জীবনে তার পুনরাবৃত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা রদ করিবার জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন তার ভিতরে আপনা হইতে সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই আভ্যন্তরিক প্রতিবাদ তার এত জোরালো যে ভ্রান্তি টুটিয়া যাওয়ার মত ঘনিষ্ঠতা আর কোন রক্তমাংসের মেয়ের সঙ্গে তার জন্মানো সম্ভব নয়। সব মেয়েই যে সুনীতির মত এ বিশ্বাস প্রমথের জন্মে নাই, সাধারণভাবে মেয়েদের সে অশ্রদ্ধা করে না। অবসর সময়ে বসিয়া বসিয়া নারীবিদ্বেষের সমর্থক যুক্তিতর্কের আবিষ্কার করার চেষ্টাও সে করে না। মেয়েদের বিচার করিতে সে একেবারেই ভালবাসে না, ওবিষয়ে মাথাঘামানোকে সে মনে করে ছেলেমানুষী। তবু সেই আঘাতটির পরবর্তী বিকারে যে অন্ধ আতঙ্ক তার হৃদয়-মনে বাঁচিয়া আছে, এই বয়সে তরুণী নারীর ভালবাসা লাভ করার স্বাভাবিক পিপাসার স্থানে সে আতঙ্ক জাগাইয়া রাখিয়াছে ততোধিক স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা। মেয়েরা ভাল, মেয়েরা দেবী। মেয়েরা ভালবাসিলে মানুষ ধন্য হইয়া যায়। কিন্তু কাজ নাই বাবা কারো ভালবাসায় প্রমথের!

এই সময় পাইবে না পাইবে না করিয়া প্রমথ একটা হাকিমী চাকরী পাইয়া গেল এবং আত্মীয়-স্বজনের কাছে বিবাহ করিবে না করিবে না ঘোষণা করিতে করিতে প্রায় হইয়া উঠিল পাগল। কোনদিন

বিবাহ না করার ইচ্ছা প্রমথের ছিল না, আর দশটি সাধারণ সুস্থচেতা মানুষের মত জীবনটা কাটাইয়া দিবার দিকেই বরং তার ছিল বেশী ঝোঁক। কিন্তু চিত্ত তো এখন তার সুস্থ নয়। এখন মন্ত্রপড়া সামাজিক বিবাহের পবিত্র বাঁধনে বাঁধিয়া একটি মেয়েকে জীবন-সঙ্গিনী করিলে যদি মনের অসুস্থতা বাড়িয়া যায়, রূপান্তর নেয়! নিজের বৌকে আদর করিতে গেলেই যদি নাকে আসিয়া লাগে ওমিলনাইনের গন্ধ, মাথা ঘুরিয়া ওঠে, গা করে বমি বমি, আর মনে হয় যে এই রক্তমাংসের জীবটির মুখ-চোখ হাসি-গল্প মান-অভিমান চাল-চলন সব সুনীতির প্যারডি? তার চেয়ে আর কিছুদিন মনটাকে সুস্থ হইবার সময় দিয়া একটু ভারিক্কি বয়সে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু করাই নিরাপদ।

এগারমাস মফস্বলে একা একা হাকিমী করিয়া ভারিক্কি বয়সের ভাবনা-চিন্তাগুলি প্রমথ আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিল কিনা বলা যায় না, এক মাসের ছুটি লইয়া আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাস করিতে আসিয়া তিনদিন স্পষ্ট 'না' ও চারদিন আমতা আমতা 'না' বলিয়া, গম্ভীর চিন্তিত মুখে সে হইয়া গেল মৌন। সুতরাং যথাসময়ে তার একটি বৌ আসিল। ঠিক বৌ নয়, সহধর্ম্মিণী অথবা জীবন-সঙ্গিনী,—সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপায়স্বরূপিণী। কারণ, এই বয়সে প্রথম বৌকে প্রথমদিকে মানুষ সচরাচর যে ভাবে চায়,—প্রিয়া বা প্রেমিকা হিসাবে, বিশেষ আত্মবিস্মৃত অবস্থাতেও প্রমথ কখনো বৌকে সেভাবে চাহিয়াছিল কিনা সন্দেহ।

নাম হাসিরাশি। একটু বেঁটে কিন্তু দেখিতে বেশ, শুনিতে আরো। অর্থাৎ গলাটি তার ভারি মিষ্টি। মাথা-ধরার অসুখ থাকার জন্য যদিও হাসিরাশি খুব বেশী হাসিখুসি নয়, স্বভাবটি ভারি শান্ত, প্রকৃতিটি কোমল। এবং বোধ হয় ওইজন্যই বয়সের তুলনায় সে একটু বেশীরকম

ভারিক্কি। মেয়েটার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিলেই বুঝিতে পারা যায় সংসারে বাঁচিয়া থাকাটাকে সে অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার বলিয়া মনে করে, জীবনধারণের যে-সব রীতি নীতি সে এতকাল জানিয়াছে ও মানিয়াছে অথবা এবার হইতে জানিবে ও মানিবে সেগুলি চিরকাল পাইয়াছে তার গভীর নিষ্ঠাপূর্ণ সম্মান এবং চিরকাল তাই পাইবে।

প্রথমবার প্রমথ যখন তার সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়াছিল তখন হাসির ভয়ানক মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া দেহে-মনে দারুণ অস্বস্তি বোধ করিয়া প্রমথ সুরুতেই হঠাৎ আলাপ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় সে কিছু মনে করে নাই। পরের বার তার মাথা খুব ঠাণ্ডা থাকায় ভাই যে-ভাবে বোনের সঙ্গে গল্প করে প্রমথ তার সঙ্গে তেমনি ভাবে গল্প জুড়িয়া দিতে অবাক হওয়ার বদলে সে খুসীই হইয়াছিল। এইসব আবেগবিহীন সহজ মানুষকেই হাসিরাশি ভালবাসে। ব্যস্ততার বদলে নিজের বৌএর সঙ্গেও যে এইরকম আস্তে আস্তে ভদ্রভাবে প্রথম চেনা-পরিচয়টা ঘটিয়া উঠিতে দেয় সে কত ভাল লোক! একবার সে যে পায়ে হাত দিয়াছিল সেটা সত্যসত্যই পিঁপড়া ঝাড়িয়া ফেলার জন্যই। এবং সেজন্য সলজ্জভাবে পায়ে হাত দিয়া তাকে প্রণাম করার সময়ও আচমকা হাত ধরিয়া সে যে তাকে খানিকটা আদর করিয়া বসে নাই এ-ও কি তার সহজ ভদ্রতার পরিচয়!

বিবাহের পর হইতেই অনেক বিষয়ে প্রমথ আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছিল, হাসিরাশিকে সঙ্গে করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের একটা সহরে প্রথম সংসার পাতিয়া বসিবার পর আরও বেশী আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল যে মানুষের জীবনের অধিকাংশ অভিজ্ঞতাই একপেশে ও অসম্পূর্ণ, অধিকাংশ ধারণা ও মতবাদ অসম্বদ্ধ ও অযৌক্তিক। তা না হইলে হাসিরাশির সাহচর্য্য তাকে কেন এভাবে বদলাইয়া দিবে? কেন

রসালো হইয়া উঠিবে আগেকার নীরস মুহূর্তগুলি, কেন তুচ্ছ ও অর্থহীন মনে হইবে না এতদিন যে সমস্তকে সে ছেলেখেলা বলিয়া মনে করিত? যে নিজেটাকে সে এত ভালভাবে জানিত বলিয়া তার ধারণা ছিল এখন সেই নিজেরই এত সব অজ্ঞাত, অনাবিস্কৃত পরিচয় কোথা হইতে তার কাছে ধরা পড়িতে থাকিবে? কি বোকার মতই এতগুলি বছর ওরকম বিশ্রীভাবে সে জীবন-যাপন করিয়াছিল! সুনীতির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিবামাত্র সে যদি হাসিরাশির মত একজনকে বিবাহ করিয়া এইরকম পবিত্র মধুর গার্হস্থ্য-জীবন আরম্ভ করিয়া দিত, যাতে, কোন্ বেলা কি রান্না হইবে সেটা পরামর্শ করিয়া ঠিক করার মধ্যে পর্য্যন্ত অনায়াসে যত খুসী প্রণয়ের আমদানী করা যায়, জীবনের এতগুলি বছর তবে তার ব্যর্থ হইয়া যাইত না।

ওগো, শুনছ?—প্রমথ বলে।

হাসি বলে, না, শুনছি না। একশোবার এমন বুড়ো মানুষের মত ডাকবে কেন শুনি?

কি বলে ডাকব তবে?

কেন, এই!—বলে ডাকবে, শিস্ দিয়ে ডাকবে, নয় তো একটা আদরের নাম দিয়ে তাই বলে ডাকবে।

প্রমথ গম্ভীর মুখে বলে, তুমি যেচে সোহাগ নিচ্ছ, হৃদয়রাণী?

হাসি আরও বেশী গম্ভীর হইয়া বলে, নিজের জিনিষ আমি যেভাবে খুসী নেব, তোমার তাতে কি? তা ছাড়া যারা ভাল মেয়ে হয় তারা বুঝি ছল ক'রে সোহাগ নেয়? পষ্ট দাবী করে।

সুনীতির সঙ্গে আরও ঢের বেশী সূক্ষ্ম হাসি-তামাসা চলিত, সুনীতি আরও ঢের বেশী আর্টিষ্টিক ভঙ্গির সঙ্গে রসাত্মক বাক্য বলিয়া কবিত্বের সৃষ্টি করিতে পারিত, তবু স্ত্রীর হাসির ভঙ্গি ও কথাই প্রমথের বেশী

উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়। হঠাৎ সুনীতির প্রতি সে একটা স্পষ্ট জোরালো ঘৃণার ভাব অনুভব করে। এতকাল পরে তার আজ প্রথম আপশোষের সঙ্গে মনে হয় যে ক্লীবের মত, দার্শনিকের মত সুনীতির অপরাধকে তার উপেক্ষা করা যেন উচিত হয় নাই, ওই ক্ষমাটা পর্য্যন্ত সুনীতি তাকে বোকা পাইয়া আদায় করিয়া লইয়াছিল। সুনীতিকে একটা ভাল রকম শাস্তি দিলে বড় ভাল হইত,—মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া হইত।

স্ত্রীর সঙ্গে এই তুচ্ছ কথোপকথনটি তার সকালবেলার। কাল হাসি সোডা দিয়া চুল সাফ করিয়াছিল, আজ তেল দিয়া স্নান করিবে। তার রুক্ষ ফাঁপানো চুলে একফোঁটা তেলের চিহ্নও নাই। তবু এই অসময়ে কোথা হইতে যে প্রমথ ঘ্রাণ পাইতে লাগিল কেশতৈলের! সেই চির-পরিচিত ওমিলনাইনের গন্ধ!

হাসি হাসি বন্ধ করিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি হল? কি হল তোমার হঠাৎ?

প্রমথ বলিল, তোমার তেলের শিশিটা নিয়ে এসো তো চট্ করে!

কেন?

আগে আনো, বলছি।

হাসি তেলের শিশি আনিয়া দিল।

দেশী তেল। গন্ধটা চড়া। ছিপি খুলিয়া শিশিটা নাকের সামনে ধরিয়া প্রমথ জোরে জোরে শ্বাস টানিতে লাগিল, হাসি অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল তার বিবর্ণ কপোলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মের আবির্ভাব। আগেও সে দু'একবার স্বামীর এরকম আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য

করিয়াছে কিন্তু কোনবারই এত স্পষ্ট ও প্রবলভাবে নয়। জিজ্ঞাসা করিতে প্রমথ ব্যাপারটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, মাথা নাড়িয়া বলিয়াছে, ও কিছু না।

আজ প্রমথ শান্ত হইলে কারণ জানিবার জন্য হাসি পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। প্রমথ বলিল, হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল।

মাথা ঘুরে উঠল বলে তেলের গন্ধ শুঁকবে কেন?

তেলের গন্ধ শুঁকলে আমার মাথাঘোরা সেরে যায়।

কি বলছ পাগলের মত? তাই কখনো হয়? কি হয়েছে তুমি বলছ না আমায়।

ওই তো বললাম!

আবোল-তাবোল কতগুলি কৈফিয়তে তখনকার মত হাসিকে শান্ত করা যায় বটে কিন্তু তার কৌতূহলের নিবৃত্তি হয় না। পরদিন সে আবার একথা তোলে। তারও পরের দিন। একবার প্রমথের মনে হয় সুনীতির কথা সব সে শোনাইয়া দেয়। কিন্তু এতকাল পরেও সুনীতির মাথার চুলের কাল্পনিক ঘ্রাণ নাকে লাগিয়া সে অতদূর অসুস্থ হইয়া পড়ে একথা জানিলে হাসি ব্যাপারটা ঠিক কিভাবে গ্রহণ করিবে বুঝিতে না পারিয়া তাকে সব কথা জানাইতে তার সাহস হয় না। কে জানে হাসি বিশ্বাস করিবে কি না যে আজকাল সুনীতির প্রতি আকস্মিক ক্রোধ ও ঘৃণার সঞ্চার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আগের চেয়েও জোরালো-ভাবে সে ওমিলনাইনের গন্ধ পায়, আগের চেয়েও বেশী বিচলিত হইয়া পড়ে। হয়ত ধীরে ধীরে হাসির সঙ্গে তার যে গভীর অন্তরঙ্গতা জন্মিতেছে এসময় হাসিকে সুনীতির কাহিনী জানাইয়া দিলে সব নষ্ট হইয়া যাইবে। সুখে শান্তিতে জীবন-যাপনের যে সম্ভাবনা তার দেখা দিয়াছে চিরদিনের জন্য তাহা হইয়া যাইবে অসম্ভব।

এতদিন পরে সুনীতির সম্বন্ধে নিজের মানসিক পরিবর্ত্তন প্রমথকে আশ্চর্য্য ও চিন্তিত করিয়া রাখে। ব্যক্তিগতভাবে একজনের সম্বন্ধে এতকাল উদাসীন থাকিবার পর, একটা বিষাদময় বৈরাগ্যে জীবনের সুখ-দুঃখকে মৃদুভাবে উপেক্ষা করিয়া দশজনের মাঝখানে এতকাল বাঁচিয়া থাকিয়া আবার বাস্তবজীবনকে ভালবাসিয়া নূতনভাবে জীবনটা আরম্ভ করিবার পর সেই একজনের প্রতি এমন ভয়ানক বিদ্বেষ ও ঘৃণা আসিবার অর্থ কি? এসব মানসিক বিকারের কি আবির্ভাব ঘটা উচিত ছিল না তখন, সুনীতির ব্যবহার যখন তাকে আধমরা করিয়া দিয়াছিল? সুনীতিকে প্রায় ভুলিয়া যাওয়ার পর সে কি তার জন্য নূতন করিয়া বিরহের জ্বালা অনুভব করিতে আরম্ভ করিল? এ তো বড় খাপছাড়া কথা!

মাঝে মাঝে কি ভাব এত?—হাসি জিজ্ঞাসা করে।

তোমার কথা ভাবি।

হাসি খুসী হইয়া বলে, সত্যি? কিন্তু আমি যখন কাছে থাকব না তখন আমার কথা ভেবো,—এখন থেকে কেন? মা তো কদ্দিন থেকে লিখছেন যাবার জন্য, এসেছিও তো অনেকদিন হল, মাসখানেকের জন্যে দাও না পাঠিয়ে আমাকে মার কাছে?

প্রমথ অস্বাভাবিক ব্যাকুলতার সঙ্গে বলে, না না, এখন তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। তোমায় ছেড়ে আমি এখন একদিনও থাকতে পারব না।

আগে প্রথমে নাকে লাগিত ওমিলনাইন তেলের গন্ধ তারপর আসিত অন্য উপসর্গ। আজকাল প্রথমে প্রমথ সুনীতির কথা ভাবিয়া

মনটা বিতৃষ্ণায় ভরিয়া তোলে তারপর আসে ওমিলনাইনের সুবাস ও পরবর্ত্তী কষ্টগুলি। ব্যাপারটা প্রমথকে বেশীরকম দুশ্চিন্তায় ফেলিয়া দিয়াছে এইজন্য যে এই অস্বাভাবিক আক্রমণ ঘটিবার সময় ছাড়া বাকী প্রায় সব সময়েই সে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিতে করিতে মহানন্দে বাঁচিয়া থাকে। আগে সে তার বিকারকে গ্রাহ্যই করিত না, এখন এরকম কেন হয় বুঝিবার চেষ্টা করে, এরকম হওয়া বন্ধ করার কোন উপায় আছে কি না বসিয়া বসিয়া তাই ভাবে।

তবে, মোটামুটি তাকে সুখীই বলা যায়। পাঁচবছরের বেশী সময়ের ব্যবধান ও কে জানে কতখানি দূরত্ব পার হইয়া সুনীতির মাথার ওমিলনাইন তেলের গন্ধ তার নাক ও মনের সঙ্গে যে রসিকতা করিতে আসে, সেটা অল্প সময়ের জন্যই। কিছুক্ষণ একটা দুর্ব্বোধ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবার পরেই সে সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারে। তখন আর বুঝিবার উপায়ও থাকে না যে তার শান্ত হাসিখুসী মুখের পিছন দিকে, চুলে-ঢাকা খুলির শক্ত হাড়ের তলে যে নরম মগজটা আছে তার মগ্ন-চেতনার অংশটুকুতে বাস করে এমন খাপছাড়া একটা বিকার।

হাসিরাশিকে প্রমথের এতই ভাল লাগিয়াছে যে, কয়েকদিনের জন্যও তাকে ছাড়িয়া থাকিবার কথা ভাবিলে সত্যসত্যই তার কষ্ট হয়। এ রকম সরলা, স্নেহময়ী, বুদ্ধিমতী ও সহজাত সু-ভাবাপন্না স্ত্রী পাওয়ার জন্য নিজেকে সে ভাগ্যবান মনে করে। বিবাহ করার আগে যা ছিল শুধু অসম্ভব কল্পনা, যে সুখ ও শান্তির স্বরূপ সে প্রায় ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিল, জীবনের নিরপেক্ষ সদয় দেবতার কল্যাণে আজ সে প্রায় সবই ফিরিয়া পাইয়াছে। শুধু ওমিলনাইনের অত্যাচার সহ্য করিবার দুর্ভাগ্যটা যদি তার না হইত! আদর্শ জীবন হইত তার, কোন দিকে এতটুকু খুঁত থাকিত না!

এমনিভাবে দিন কাটিতে কাটিতে পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ছুটিটা কাটাইবার জন্য প্রমথ সস্ত্রীক আসিল কলিকাতায়। কলিকাতায় পৌছিবার দিনই সন্ধ্যার পর তার রহস্যময় মোহের রাজ্য হইতে ওমিলনাইনের গন্ধ ভাসিয়া আসিয়া তাকে ভয়ানক উতলা করিয়া দিল। পরদিন সকালে সে হাসিকে বলিল, তুমি মাথায় যে তেল মাখো ওটার গন্ধ ভারি বিশ্রী। আমি একটা আশ্চর্য্য তেল এনে দিলে মাখবে?

আশ্চর্য্য তেল আবার কি জিনিষ গো, এঁ্যা?

কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন তেল মিশিয়ে আমি নিজেই তৈরী করে দেব, মাখবে তো?

ওমা, কেন মাখব না? চুল উঠে গেলে কিন্তু মজা দেখাবো তোমায়! সে দায়িত্ব তোমার।

প্রমথ বলিল, উঠে যাবে?—চুলের ভারে হাঁটতেই পারবে না দেখো। কি নাম জান তেলটার? ওমিলনাইন।

কিছুকাল হইতে এই কথাটা প্রমথ ভাবিতেছিল। অস্তিত্বহীন ওমিলনাইন যদি তাকে এরকম ভাবে বিরক্ত করে, নিজের চারদিকে আসল ওমিলনাইনের গন্ধ ছড়াইয়া রাখিয়া ক্রমে ক্রমে গন্ধটা অভ্যস্ত করিয়া আনিলে হয়তো আর সে বিচলিত হইবে না? সব সময় যে গন্ধ সে অনুভব করিবে সে গন্ধের কাল্পনিক আবির্ভাব হয়তো সে টেরও পাইবে না? প্রথমটা হয়তো সর্ব্বদা এই গন্ধ শুঁকিতে তার খুবই খারাপ লাগিবে, হয়তো অল্প সময়ের ব্যবধানে বারংবার তার মনের বিকার জাগিয়া উঠিবে, মাথা-ঘোরা গা বমি বমি করার আর বিশ্রাম থাকিবে না। তবু, আসল ওমিলনাইনকে অভ্যাস করিয়া শেষ পর্য্যন্ত নকল ওমিলনাইনকে যদি জয় করিতে পারা যায়, একবার সে চেষ্টা করিয়া দেখা ভাল।

একবার স্নীতিকে প্রমথ ওমিলনাইনের উপকরণগুলি উপহার দিয়াছিল। শুধু এইজন্য ন'টি বিভিন্ন তেলের নাম এতকাল পর্য্যন্ত কারো মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রমথের জীবনে ওমিলনাইন কেবল একটা মিশ্রিত কেশ-তৈল নয়, স্নীতির সঙ্গে বিচ্ছেদের পর স্নীতির চেয়ে এই তেলটার কথাই বোধ হয় তাকে ভাবিতে হইয়াছে বেশী, এখনো না ভাবিলে চলে না। ন'টি তেলের প্রত্যেকটির নাম আজও তার নিজের নামের চেয়েও স্পষ্টভাবে মনে আছে।

সেইবেলাই ওমিলনাইনের উপকরণ আসিল। ছোট-বড় দেশী-বিলাতী ন'টি বিভিন্ন কেশতৈলের শিশি। তাকে তেল মাখানোর জন্য স্বামীর আয়োজন ও আগ্রহ দু'টারই পরিমাণ দেখিয়া হাসিরাশি হাসিতে লাগিল।

এতগুলি তেল মাখব?

দাঁড়াও না, এমন তেল তৈরী করে দেব, গন্ধে সবাই মূর্চ্ছা যাবে। বিকেলে এই তেল দিয়ে চুল বেঁধো, কেমন?

দুপুরে একটা কাচের পাত্রে তেলগুলি মেশানো হইল। তখন প্রমথ আশ্চর্য্য হইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল তার এতদিনকার কাল্পনিক ওমিলনাইনের সঙ্গে এই আসল ওমিলনাইনের গন্ধের কিছু পার্থক্য আছে। যতক্ষণ এই পার্থক্যটুকু খেয়াল করিয়া সে বিস্মিত হইয়া রহিল ততক্ষণ তার আর কোন ভাবান্তর দেখা গেল না কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে সে অভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। মাথা ধরিল না প্রমথের, গা বমি বমি করিতে লাগিল না, একটা নূতন ধরণের অস্বস্তিকর রহস্যময় যন্ত্রণা বোধ করিতে আরম্ভ করিল। ভয়ানক একটা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলেও কি ঘটে দেখিবার জন্য বাধ্য হইয়া প্রতীক্ষা করিতে হইলে মানুষের যেমন লাগে সেইরকম একটা ক্লেশদায়ক

বিপন্নতার অনুভূতি। এক একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ থাকে, তামাসা করিয়া একটা ছোট ঘরে কয়েক মিনিটের জন্য বন্দী করিয়া রাখিলেও যাদের দম আটকাইয়া আসে, ভয়ে আধমরা হইয়া যায়। ওমিলনাইনের গন্ধের আবেষ্টনী তেমনি পীড়ন করিতে লাগিল প্রমথকে। সে জোরে জোরে শ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিল।

প্রথমটা হাসিরাশি পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি গো, কি হোল তোমার? তেলের গন্ধে নিজেই মূর্চ্ছা যাচ্ছ নাকি সত্যি-সত্যি? —গন্ধটা সত্যি ভারি অদ্ভুত!

তারপর ভয় পাইয়া সে কাচের পাত্রটা প্রমথের সম্মুখ হইতে ঠেলিয়া দিয়া নিজেই সেখানে বসিয়া পড়িল, প্রমথকে নাড়া দিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, কি হোল? কি হোল তোমার হঠাৎ? এমন করছ কেন?

প্রমথ কাতরভাবে বলিল, কিছু হয় নি।

হাসিরাশি ব্যাকুল হইয়া বলিল, হয়নি! তোমার মুখ দেখে বুকের মধ্যে কাঁপছে আমার। কি হয়েছে বল না?

প্রমথ একথার কোন জবাব দিল না। উঠিয়া জামা গায়ে দিল।

হাসি জিজ্ঞাসা করিল, কোথা যাচ্ছ?

ভবানীপুর যাব।

ভবানীপুর সে গেল বটে কিন্তু গেল পার হইয়া। হাজির হইল বালীগঞ্জে, সুনীতির গৃহে। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সে যে-ভাবে সোজা ওখানে গিয়া পৌঁছিল তাতে একথা মনে করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল যে সুনীতিকে দেখিবার জন্যই সে বাড়ীর বাহির হয় নাই।

সুনীতি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, কি আশ্চর্য্য! কি ভাগ্য আমার! বোসো, বোসো। কবে এলে কলকাতায়? তুমি এখন কুমিল্লায়

পোষ্টেড্ আছ, না? তুমি অবিশ্যি আমায় ভুলে গেছ, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমি কত খবর রাখি দেখছো! বিয়ে করেছ নাকি?

প্রমথ বলিল, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব সুনীতি। তুমি এখনো চুলে ওমিলনাইন তেল মাখো? গন্ধ পাচ্ছি না তো?

সুনীতি আরও আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, এ্যাদ্দিন পরে এসে, প্রথমেই এই কথা জিজ্ঞাসা করলে? না, ওমিলনাইন ফোমিলনাইন মাখি না আর। ও সব আর ভাল লাগে না। মানুষ কি চিরদিন একরকম থাকে?

হঠাৎ সুনীতি গম্ভীর ও বিষণ্ণ হইয়া গেল।—তুমিই বল, চিরদিন কি মানুষ একরকম থাকে? তখন ঐরকম স্বভাব ছিল, খাপছাড়া কাজ করতেই ভালবাসতাম। মাথার তেলটা পর্য্যন্ত নতুন কিছু না হলে চলত না। সে স্বভাব অনেকদিন গেছে। এখন—

আচ্ছা, আজকে উঠলাম সুনীতি।

আসতে না আসতে উঠলে কি রকম? এরকম আসার মানে? বোসো না একটু, খানিক কথাবার্ত্তা বলি?

প্রমথ সহজ ভাবেই বলিল, না, বসার সময় নেই। বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে সঙ্গে করে সিনেমায় যেতে হবে।

সুনীতি বলিল, ও, এবার বুঝতে পারছি। একটি স্ত্রী সংগ্রহ করেছো এই খবরটা দিতে এসেছিলে। তিনি কি রকম রূপসী আর গুণবতী সে বর্ণনাও দাও, মন দিয়ে শুনছি। একটা কিছু করতে এসে কাজটা অসম্পূর্ণ রেখে যেতে নেই।

প্রমথ বলিল, রূপ-গুণ তেমন কিছু নেই সুনীতি। তবে মনটা খুব সবল আর চরিত্রটা ভাল।

সুনীতির বাড়ী হইতে প্রমথ নিজেদের বাড়ী ফিরিল না, এদিক-ওদিক

খানিক ঘুরিয়া একাই সিনেমা দেখিতে গেল। মানুষের সরলতা ও সুচরিত্রতা তার কাছে হঠাৎ মূল্যহীন, অর্থহীন, অকারণ মনে হইতেছিল। কি আসিয়া যাইত সে সময় সুনীতিকে ক্ষমা করিলে, তার চাকরীর খবর গেজেটেড্ হওয়ার পর সুনীতি যখন তাকে একখানা পত্র লিখিয়াছিল?

হাসিরাশি ওমিলনাইন তেল মাখিয়া চুল বাঁধে, সারারাত তার মাথাটি থাকে প্রমথের মাথার পাশে। ভাল ঘুম হয় না প্রমথের। দিনের বেলা বাড়ীর যেখানে যায় সেখানেই যেন প্রমথ ওমিলনাইনের গন্ধ পায়, আত্মীয়-স্বজনেরা যেন ঘুরিয়া বেড়ায় ওমিলনাইনের গন্ধ ছড়াইয়া। ওমিলনাইনের সুবাসে বাড়ীর সকলে মূর্চ্ছা যায় নাই কিন্তু মোহিত হইয়া গিয়াছে। সকলে আগ্রহের সঙ্গে ওই তেলটাই ব্যবহার করে। হাসিরাশি নারী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকেই তেলটা বিলায়। স্নানের আগে প্রমথকেও মাখিতে দেয়।

প্রমথ হঠাৎ বলে, ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি আমার সঙ্গে?

হাসিরাশি স্তম্ভিত হইয়া বলে, ইয়ার্কি? কি বলছ তুমি?

প্রমথ মুখ ফিরাইয়া বলে, আমি সর্ষের তেল ছাড়া কিছু মাখিনা জান না তুমি?

একদিন অন্য তেল মাখতে বললে বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

হাসিরাশি অভিমান করিয়া থাকে। স্ত্রীর অভিমান ভাঙ্গাইতে গিয়া এবার প্রমথের মন ক্ষোভে দুঃখে পূর্ণ হইয়া যায়। আর একজন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলিয়া ভাঙ্গাইবে শুধু এই জন্য যে অভিমান, এবার সে অভিমানকে তার অতি কদর্য্য বলিয়া মনে হয়। সরলতা না ছাই।

একরঙা ছবির মত এ শুধু বৈচিত্র্যের অভাব। হাসিরাশি আগে যে সাধারণ একটা তেল মাখিত ওমিলনাইন তেলের তুলনায় সে তেল যেমন, কুটিল ও জটিল সুনীতির তুলনায় হাসিরাশিও তেমনি।

ছুটি শেষ হওয়ার দু'দিন আগে প্রমথ একদিন হঠাৎ হাসিরাশিকে বলিল, তোমাকে নেবার জন্তে ওরা খুব ব্যস্ত হয়েছে, না ?

হাসিরাশি বলিল, হবে না ? প্রায় আট মাস হল এসেছি।

তোমারও খুব যেতে ইচ্ছে করে তো ?

ওমা, বাপের বাড়ী যেতে ইচ্ছে করে না কার ?

সুদীর্ঘ শ্বাস টানিয়া হাসিরাশির মাথার ওমিলনাইন তেলের ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া প্রমথ বলিল, তা'হলে চল কাল আমরা বেরিয়ে পড়ি। তোমাকে বাপের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আমি একা কুমিল্লা চলে যাব। একা একা আমার খুব কষ্ট হবে বটে, তবু—

জন্মের ইতিহাস

খোকার আসার যখন মাস কয়েক বিলম্ব ছিল মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত দুজনের জল্পনা কল্পনার আর বিরাম থাকিত না। তার অর্দ্ধেক বাস্তব অর্দ্ধেক অবাস্তব এবং প্রায় সমস্তটাই স্বপ্নবৎ মনোরম। এ হেন আশ্চর্য্য সম্ভাবনা যেন জগতের আর কোন নরনারীর জীবনে আজ পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই। তিন বছর ধরিয়া তাহাদের যে অনন্যসাধারণ প্রেম বসন্তের ফুলবনে পথ-ভোলা পথিকের মত লক্ষ্যহীন দায়িত্বহীন বাধাহীন অবস্থায় ঘুরিতেছিল আজ লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া মাত্র সে প্রেম তাহাদের স্বর্গে মর্ত্যে অতীত ভবিষ্যৎ ইতিহাসে সকল প্রেমের মধ্যে অতুলনীয় হইয়া গিয়াছে।

লণ্ঠন নিভাইয়া সুলতা তেলের প্রদীপ জ্বালিয়াছে, তাহারা ঘুমাইয়া পড়িবার পরেও ঘরের কোণে এ দীপ জ্বলিতে থাকে। খানিক আবোল তাবোল বকিবার পর বিকাশ বলে, 'বৌ অনেকের থাকে সুলতা, কিন্তু তোমার মত বৌ—'

সুলতা মনে মনে বলে, 'কত জন্মের তপস্যা আমার সেটাতো দেখতে হবে ?'

বিকাশের একটু উচ্ছ্বাস জাগে, আন্তরিক নাটকীয় সুরে সে বলে 'না সুলতা, তুমি শুধু আমার প্রিয়া নও, প্রিয়ারও বেশী। ঠিক যে

তুমি কি তা অবশ্য আমি বলতে পারি না কিন্তু বেশ বুঝতে পারি তুমি প্রিয়ারও অতিরিক্ত কিছু।'

লজ্জায় সুলতা হাসে, বলে 'থামো, এত বাড়িও না। এতদিন বাইরের লোক স্ত্রৈণ বলেছে, এবার তাহলে আমিও বলতে সুরু করব।'

বিকাশ বলে 'হু বল না। গলা বুজে আস্‌বে। স্ত্রীকে যে দুর্ভাগারা ভালবাসতে পারে না, তারাই পরকে স্ত্রৈণ বলে গাল দেয়। তুমি কি ও কথা বলতে পার?'

সুলতার চোখ ছল ছল করিয়া আসে। স্ত্রীকে যে দুর্ভাগারা ভালবাসিতে পারে না তাহারা সুলতার অজানা জগতের মানুষ নয়। পাশের বাড়ীতেই চরম দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কি কান্নাই বৌটা এক একদিন কাঁদে? ভালবাসুক আর না বাসুক স্ত্রীকে যার অমন ভাবে কাঁদিতে হয় সে দুর্ভাগ্য বৈ কি!......

ভালবাসার ভবিষ্যৎ ভাগবাটোয়ারা নিয়া রোজ তাহাদের তর্ক হয়।

সুলতা স্বীকার করে না তার ভালবাসার সীমা আছে। ছেলেকে ভালবাসা দিতে হইলে স্বামীর ভাগটা ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে,—একথা শুনিলে তাহার হাসি পায়।

'তোমার জন্যে যে ভালবাসা সে তোমারি থাকবে গো, খোকার জন্য নতুন ভালবাসা জন্মাবে। তুমিই বরং আমাকে আর তেমন—'

'দেখো! খোকাকে নিয়ে আমার দিকে যখন তাকাবারও সময় পাবে না—'

এমনি সব অর্থহীন কথার খেলা। অথচ ইহারি ভিতর দিয়া—দুজনের যে অনির্ব্বচনীয় মিলন ঘটিয়া চলে প্রেরণার মুহূর্ত্তেও কি কোন কবি কোনদিন তাঁর মানসীর সঙ্গে তেমন মিলনের স্বাদ পাইয়াছে?

—'যে কাঁথাটা ধরেছিলে শেষ হ'ল?'

'একটু বাকী আছে। আজ হয়ে যেত, ঠাকুরঝি এমন ঠাট্টা সুরু করলে—'

—'মিনুর খোকার জন্য মা আর কাঁদে না দেখেছ?'

'দেখেছি বৈকি। কেন বলত?'

'তোমার খোকার পথ চেয়ে আছেন। তোমার যে খুকীও হতে পারে একথা কিন্তু মার মনেও পড়ে না!'

'তোমার পড়ে?—'

—'আমি হার দিয়ে খোকার মুখ দেখব সুলতা।'

'মা যে হার দেবেন ঠিক করেছেন!'

'ও, হ্যাঁ। মনে ছিল না। আমি তবে কি দেব বলত?'

'ওর মাকে একটু ভালবাসা দিও।'

এমনি ভাবে তাহারা কথার পিঠে কথা গাঁথিয়া চলে, কখন যে তাহা হাস্যপরিহাসে দাঁড়াইবে কখন গভীর আলোচনার রূপ নিবে কিছুরই স্থিরতা থাকে না। দুজনের মনেই যেন স্বয়ংক্রিয় গ্রামোফোন ও একস্তূপ রেকর্ড আছে, কীর্ত্তনের পরেই কমিক গান বাজিয়া যায় এবং গ্রামোফোনের প্রথম শ্রোতা বালকবালিকার মত তাহাতেই তাহাদের সবিস্ময় পুলকের অন্ত থাকে না।

শেষরাত্রে হঠাৎ সুলতার ঘুম ভাঙ্গাইয়া খোকা কার মত দেখিতে হইবে এবং কি নাম রাখিলে সমবেত ভাবে দুজনের পছন্দের মর্য্যাদা থাকিবে এ আলোচনা আরম্ভ করা বিকাশের কাছে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য মনে হয় না। কিন্তু দিন ঘনাইয়া আসার সঙ্গে তাহাদের ছেলেমানুষী আলোচনা কমিয়া যায়। একটা ভয়ঙ্কর বিপর্য্যয় ঘটিবার প্রতীক্ষায় সুলতার দেহ যেমন অস্থির অস্থির করে মনে তেমনি একটা একটানা ভয় বাসা বাঁধে। স্বামীর একটা হাত বুকে চাপিয়া সে অনেক রাত্রি

অবধি নীরবে জাগিয়া থাকে, বিকাশ তাহার বক্ষের দ্রুত স্পন্দন অনুভব করে।

'ভয় কি সুলতা?'

সুলতা আরও শক্ত করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরে। কথা বলিতে গিয়া তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না।

আত্মীয় পরিজন সকলের মুখে অল্পবিস্তর চিন্তার লক্ষণ দেখা দেয়, বয়স্কেরা মাঝে মাঝে গম্ভীরভাবে নানারকম পরামর্শ করেন, মন্থরগতিতে আগামী ঘটনার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আয়োজন চলিতে থাকে।

বিকাশের বিধবা মা মা কালীর কাছে মানত করেন, ভালয় ভালয় একটি খোকা দিও মা, খোকা দিও। জোড় পাঁঠা দিয়ে পূজো দেব।

কোথা হইতে গোটা তিনেক মাদুলি সংগ্রহ করিয়া পুত্রবধূর বাহুতে বাঁধিয়া দিয়াছেন, কিন্তু শুধু কি মাদুলির উপর নির্ভর করিয়া থাকা যায়? মা কালীর ঘাড়েও দায়িত্ব চাপাইয়া তিনি স্বস্তি খোঁজেন।

কি জানি কি হইবে? একবার ভালয় ভালয় হইয়া গেলে পরেরবার অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকা চলে। প্রথমবারই যত ভয়।

আপিসের কাজে বিকাশের মন বসে না, চলিতে বার বার কলম থামিয়া যায়, সময় যেন ভ্রূণভারবাহী মন্থর-গমনা অলস বধূ। বাহিরে কোনদিন রোদ ওঠে কোনদিন মেঘের ছায়া পড়ে কোনদিন অবিশ্রাম ধারাপাত হয়। ফ্যানের বাতাসে কাগজপত্র মৃদুশব্দ করিয়া নড়িতে থাকে, চোখ বুজিলে মনে হয় কোরা তাঁতের সাড়ী পড়িয়া সুলতা কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুলতার নিকট হইতে কয়েক ঘণ্টার জন্য দূরে থাকাটাও বিকাশের কাছে আজকাল অভিনব হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভাবনার মধ্যে সুলতার সঙ্গ সে এমন নিবিড়ভাবে অনুভব করিতে পারে, মমতার এমন সব

অভূতপূর্ব্ব অনুভূতির সন্ধান সে পায় যে তাহার মনে হয় শুধু সুলতার নয় নিজেরও অনেক আশ্চর্য্য গোপন পরিচয় ধরা পড়িতেছে।

এ অমৃত যে একদিন ভালবাসার ভিত্তিগত দৈহিক প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ ছিল বিকাশ আর তাহা বিশ্বাস করে না। তাহার মনে হয় বহুকাল ধরিয়া সে শুচিশুদ্ধ তপস্যা করিয়াছিল এতদিনে সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। মানুষের প্রতি মানুষের যুগধর্ম্মের প্রতি বিকাশের কৃতজ্ঞতার সীমা থাকে না। স্ত্রীকে সে আজ সত্যই শ্রদ্ধা করে।

সুলতার মনে হয় সে যেন নেশা করিয়াছে। আনন্দের নেশা আতঙ্কের নেশা প্রাণধারণের নেশা।

স্বামীর অতিরিক্ত ভালবাসার কথা একান্তে বসিয়া ভাবিতে গেলে কোথায় যেন তাহার একটু বাধিত, মনে হইত ইহাকে প্রাপ্য মনে করা অনুচিত, এতবেশী করিয়া পাওয়া অন্যায়। আজ আর পাওনার কাছে দাবীকে ছোট মনে হয় না। নিজের মূল্য নিজের কাছেই সুলতার আজ অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে।

দুপুরটা ঘরে বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতে করিতে অলসভাবে দেয়ালে ঠেস দিয়া সুলতা চোখ বোজে। এই ঘরে সে তিন বছর ধরিয়া বাস করিতেছে, তিন বছরের ইতিহাসে এ ঘর যেন ঠাসা, বাতাসে যেন পুরাণো মাটির গন্ধ।

এই ঘরে তার প্রথম স্বামী-স্পর্শ জুটিয়াছিল!

সেদিনের বুক দুরু দুরু পুলক আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। আকাশের অশ্রু-ছাঁকা সূর্য্যালোক যেমন আকাশের গায়েই রামধনু আঁকিয়া দেয়, আত্মীয়-বিচ্ছেদ-বেদনায় পরমাত্মীয়ের সোহাগ মনে সেদিন তেমনি রঙ মিশাইয়াছিল; ভ্রূণস্পন্দনে যেন তাহারই চঞ্চল চেতনা!

তারপর একদিন দুপুরে খাইতে বসিয়া সুলতা খানিকক্ষণ মাথা

ভাত নিয়া নাড়াচাড়া করিল, শেষে পাংশুমুখে হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিল।

মৃণ্ময়ী বলিল 'ওকি বৌ? খাও? ভারি মাসে আবার কিসের অরুচি।'

স্নেহলেশ-শূন্য কণ্ঠ। এবং তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তার হৃদয়ে স্নেহ নাই, মমতা নাই, ঘুমানো আগ্নেয়গিরির মত তার বুকভরা শুধু জ্বালা। স্বামী তাহাকে নেয় না, এই সেদিন পাঁচ বছরের ছেলেটা মরিয়াছে। সহ্যের অতিরিক্ত বলিয়া তাহার শোক আজ আর বেদনার ব্যাপার নয়,—মনের বিকার, হৃদয়ের রুক্ষতা।

সুলতা বলিল 'আমার গা কেমন করছে ঠাকুরঝি—বড্ড খারাপ লাগছে।'

'বলো কি বৌ' বলিয়া মৃণ্ময়ীর যেন বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ক্ষণকাল একাগ্র দৃষ্টিতে সে ভ্রাতৃবধূর মুখখানি নিরীক্ষণ করিল। কতকাল পরে তাহার শুষ্ক চোখ দুটি আজ আবার জলে ভরিয়া উঠিতে চায়।

মুখ ফিরাইয়া নিয়া হঠাৎ অনাবশ্যক শব্দ সহকারে মৃণ্ময়ী হাঁকিল 'ওমা! মা! শুনছ? বৌএর শরীর কেমন করছে দেখে যাও।'

মা পূজায় বসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম সারিয়া উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন 'কি বৌমা, কি? কি রকম বোধ করছ?'

কি রকম যে বোধ করিতেছে সুলতা নিজেই তাহা বোঝে না, শাশুড়ীকে বলিবে কি। দেহের প্রত্যেকটি অণু যেন আপনাকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, মাথাটা এমন ভারি যে মাটিতে না নামাইলে খসিয়াই পড়িবে বোধ হয়, অজস্র এলোমেলো চিন্তা জড়াজড়ি করিয়া মনের মধ্যে আসা যাওয়া সুরু করিয়াছে।

সে করুণস্বরে বলিল 'কেমন যেন লাগছে মা অস্থির অস্থির করছে।'

মা চিন্তিত মুখে বলিলেন, 'কি জানি, এখনো কিছু বলা যায় না। ঘরে গিয়ে তুমি বরং শুয়েই থাক বৌমা, খেয়ে আর কাজ নেই। ব্যথা ট্যথা টের পাওয়া মাত্র আমায় কিন্তু জানিয়ো বাছা, দাই ডাকতে হবে, বিকুর কাছে খবর পাঠাতে হবে—'

সুলতার ইচ্ছা হইল বলে, দাই ডাকিতে লোক যাক, বিকাশের কাছে লোক ছুটুক, যত কিছু আয়োজন দরকার সব সমাপ্ত হইয়া থাক। ডাক্তার ডাকার কথাটা তো শাশুড়ী কই উল্লেখ করিলেন না? শুধু দাই এর উপর ইহারা নির্ভর করিয়া থাকিবে নাকি?

বিকাশ বলিয়াছে দরকার হোক বা না হোক (ভগবান করেন যেন দরকার না হয়) প্রথম হইতে একজন ডাক্তার আনিয়া বসাইয়া রাখিবে। কিন্তু সে খবর পাইয়া আপিস হইতে আসিবার পূর্ব্বেই যদি ভয়ানক কিছু ঘটিয়া যায়? সে যদি অজ্ঞান হইয়া পড়ে? যদি মরিয়া যায়?

মৃণ্ময়ী তীব্র দৃষ্টিতে সুলতার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন দেখিতেছিল, ঠোঁট ভাঙ্গিয়া হাসিয়া বলিল 'বৌ-এর মুখ দেখেছ মা? যেন ফাঁসি যাচ্ছে। সারাজন্ম ছেলে বিইয়ে কাটবে, মেয়ে মানুষের এতে এত ভয় কিসের শুনি?'

মা বলিলেন 'আহা, তুই চুপ কর মিনু।'

মৃণ্ময়ী উদ্ধত ভাবে বলিল 'কেন চুপ করব? হক্ কথা বলব তার আর চুপ করা করি কি!'

সুলতা ছল ছল চোখে চাহিয়া রহিল। মা বলিলেন 'যাও বৌমা, তুমি শুয়ে থাকগে। ভাততো মুখেও করলে না, একটু গরম দুধ খাবে?'

সুলতা মাথা নাড়িল। মৃণ্ময়ী বলিল, 'খোকা যখন হয়, আমার শাশুড়ী আমায় একবাটি দুধ গিলিয়েছিল মা। শেষে মরি আর কি বমি করে!'

সুলতা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। বার দুই অকারণেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। চোখ বুজিয়া সে ভাবিতে লাগিল, ও কি ঠিক সময়ে আজ আসতে পারবে'? সকাল বেলাই শরীর ভাল ঠেকছিল না, কেন বললাম না তখন ?

ছোট ননদ সুধাময়ী পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া সন্তর্পণে বিছানার একপাশে বসিল, কানে মুখ রাখিয়া চুপি চুপি বলিল 'বৌদি সেই যে বলবে বলেছিলে, এবার বল!'

সুলতা অবাক হইয়া গেল। কিশোরী মেয়ের একি কৌতূহল! বিবাহের কথায় যে এখনো ভাল করিয়া লজ্জা পাইতে শেখে নাই সে জানিতে চায় পৃথিবীর আলোবাতাসের ডাকে খোকা সাড়া দিতে চাহিলে জননীর কেমন লাগে!

মাংসের সীমানায় আলোর জন্মেরও পূর্ব্বেকার যে আদিম অন্ধকার নিয়া মানুষ পৃথিবীতে আসে, পৃথিবীর আলো কোনদিনই যে অন্ধকারের নাগাল পায় না, চিতাগ্নির পথে যে অন্ধকার আত্মার আলোর যবনিকার ওপারে চলিয়া যায়, সেই অন্ধকারে শিশুর অস্তিত্ব সুধার মনে জিজ্ঞাসা জাগায় না। জীবনের আরম্ভ তাহার কাছে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর,— আঁতুরে। সে শুধু জানিতে চায় ওই আরম্ভটা কেমন, শিশুর কাছে উহা কেমন লাগে। অকস্মাৎ চারিদিকে আলো ও শব্দের সমারোহ তাহার নিজের একদিন কেমন লাগিয়াছিল? যে মা হইতে বসিয়াছে তাহার অনুভূতির মধ্যে সে এই দুর্ব্বোধ্য ঝাপসা কৌতূহলের সমাপ্তি খোঁজে।

গতকল্য বেশ মনে পড়ে, গতবৎসর এতটুকু অস্পষ্ট নয় এই উজ্জ্বলতা কমিয়া কমিয়া সীমান্তের কাছে স্মৃতি শুধু কয়েকটা অস্পষ্ট বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তাহার পরেই এক অদ্ভুত রহস্য ভরা কুয়াশা।

সুধা জানিতে চায় ওই রহস্যের মধ্যে সে কি ছিল।

জবাব না পাইয়া তাহার রাগ হইয়া গেল। বলিল 'বল্‌বে না তো? আচ্ছা, নাই বললে।'

সুলতা বলিল, 'বলছি। বড় মাথা ধরেছে।'

সুধা হতাশ হইয়া বলিল 'এই শুধু?'

'আর ভয় করছে।'

ভয়! মনে হইল এবার যেন সুধা তাহার প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াছে। চোখ বড় বড় করিয়া সে বলিল 'ভয় করছে বৌদি? ভারি আশ্চর্য্য তো!' বলিয়া কিশোরী মেয়েটি এক মুহূর্ত্তে গম্ভীর বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইয়া উঠিল।

বিকালের দিকে আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না যে আজ রাত্রির অন্ধকারেই আকাশে একটি নূতন জন্ম তারকা দেখা দিবে।

ক্লিষ্টস্বরে সুলতা বলিল 'সুধা ভাই, মাকে বল ওঁর কাছে লোক যাক্।'

সুধা বলিল, 'দাদার আসবার সময় হয়েছে, এক্ষুনি এসে পড়বে।'

সুলতা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। বাড়াবাড়ি করিতে লজ্জা বোধ হয় কিন্তু কি করিয়াই বা চুপচাপ থাকা যায়? ছেলের চেয়ে স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকাটাই তাহার কাছে অধিকতর দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। এই কথাটা ইহাদের সে বোঝায় কেমন করিয়া?

খানিক পরেই সুলতা আবার বলিল 'কিন্তু আপিস থেকে ও যদি কোথাও চলে যায় ভাই? কোন বন্ধু যদি বায়স্কোপে ধরে নিয়ে যায়? কি হবে তাহলে?'

মৃণ্ময়ী সারা দুপুর বার বার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিয়াছে। সুলতার এ কথাটা সে শুনিতে পাইল। উঁকি দিয়া বলিল 'কি আর হবে তা হোলে, পৃথিবী রসাতলে যাবে! সে পুরুষ মানুষ এসে তোমার

কাছে কি করবে শুনি? আমরাও ছেলে বিইয়েছি বৌ, এমন বেহায়াপনা কখনও করিনি!'

সে অতীত কথা। মনে হয়, এ জন্মে বোধ হয় ঘটে নাই। কী যন্ত্রণার মধ্যেও বাহিরে স্বামীর অস্থির পাদচালনার বিষয়ে সচেতন হইয়া ছিল আজ তাহা অস্পষ্ট মনে পড়ে মাত্র।

সেই খোকা আজ নাই, সেই স্বামী আর খবর নেয় না। অস্পষ্ট ভাবেও সেই শীতের রাত্রির কথা যে স্মরণ আছে ইহাই যেন আশ্চর্য্য। হয় ত আজ রাত্রে আর অস্পষ্ট থাকিবে না,—কে বলিতে পারে? বৌ যখন ব্যথায় কাতরাইতে আরম্ভ করিবে তাহার চিত্তেও হয় ত অচেতনার স্পর্শ লাগিবে, বুকের মধ্যে চঞ্চল পদে একজন হাঁটিয়া বেড়াইবে, বিনিদ্র রজনী আর পোহাইতে চাহিবে না।

মৃণ্ময়ীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল। সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাহার পা দুটি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, রোয়াকে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল আজ রাত্রিটা কোথাও কাটাইয়া আসা যায় না? পাড়ার কাহারো বাড়ীতে হোক, ভবানীপুরে পিসিমার বাড়ীতে হোক, এবাড়ীর সমারোহের সংবাদ যেখানে আজ পৌঁছিবে না?

ছোটবাড়ী, অন্দরের গা ঘেঁষা বৈঠকখানা। ভিতরের দিকে দরজায় একটি মুখ উঁকি দিতেছিল, মৃণ্ময়ীকে চাহিতে দেখিয়া চাপা গলায় বলিল 'বিকুদা বাড়ী আছে?'

মৃণ্ময়ী তীব্রকণ্ঠে বলিল 'যান্, যান আপনি। চাষা।'

এতক্ষণ অবধি ছাদে রোদের মধ্যে দাঁড়াইয়া মুখে কালিমার ছাপ পড়িয়াছিল, আরও একটু কালো হইয়া মুখখানা সরিয়া গেল। মৃণ্ময়ী ধীরে ধীরে উঠিয়া দোতালায় গেল,—কপালে সিঁদুর পরিতে। সিঁদুরের কৌটার অভাবে তাহার কপাল সুর সুর করিতেছিল। কপালই বটে!

সাদা হাড়ের উপরে খানিকটা টান করা সাদা চামড়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সিঁদুরের টিপ পরিয়া মৃণ্ময়ী আয়নায় মুখ দেখিল। মনে হইল কপালটা তাহার এমনি সাদা যে লাল সিঁদুরের চেয়ে কালো কাজলের ফোঁটা হইলেই যেন মানাইত ভাল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া বাড়ীতে পা দেওয়া মাত্র পাঁচু টের পাইল বাড়ীর আবহাওয়া ভয়ঙ্কর ভাবে বদলাইয়া গিয়াছে। বারান্দায় ষ্টোভ জ্বলে নাই, বৈকালিক জলযোগের কোন আয়োজন দেখা যায় না। একটা চাপা চাঞ্চল্য যেন চারিদিকে জমাট বাঁধিয়া আছে, প্রাইজ বিতরণের দিনে স্কুলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিবার আগে যেমন হয়, তেমনি। পশ্চিমের ছোট অন্ধকার ঘরখানা ইতিপূর্ব্বে একদিন পরিষ্কার করা হইয়াছিল, এই অবেলায় দিদিমা আবার সে ঘরের মেঝে পুঁছিতেছেন, দিদিমার মুখের ভাব অন্ধকার ঘরখানার মতই সন্দেহ-জনক। বড়মাসীর মুখের রূক্ষতা যেন বাড়িয়াছে, ছোটমাসী বসিয়া আছে মামীর শিয়রে।

কি শিথিল অবসন্ন মামীমার পা গুটাইয়া শুইবার ভঙ্গি! কাহাকেও প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইল না পাঁচু মুহূর্ত্তমধ্যে সব বুঝিতে পারিল। বইখাতা হাতে বিস্ফারিত চোখে সে সুলতার দিকে চাহিয়া রহিল। উত্তেজনায় তাহার ছোট বুকখানির মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিতেছিল। ঘরে সে ঢুকিতে পারিল না। চৌকাঠ ডিঙ্গাইবার ক্ষমতা সে আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

সুধা বলিল 'কিরে পাঁচু?'

পাঁচু সলজ্জ হাসিয়া সরিয়া গেল। বারান্দার মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে ভাবিয়া পাইল না কোন দিকে যাইবে, এ বাড়ীর কোন ঘরে আজ তাহার কি প্রয়োজন।

মার জন্য পাঁচুর আজ সহসা বড় কষ্ট হইতে লাগিল, তাহার দুই চোখ

জলে ভরিয়া গেল। তাহার মা থাকিলে মামীমা তাহাকে এমনভাবে শাস্তি দিতে পারিত না।

দাইএর কাছে খবর গিয়াছিল, একটা কাপড়ের পুঁটলি হাতে পান চিবাইতে চিবাইতে সে আসিয়া দাঁড়াইল। পরণের মোটা কাপড়খানা তাহার যেমন নোংরা তেমনি দুর্গন্ধ। তা, কাজটাও তাহার অতিশয় নোংরা বৈকি।

হাতে মুখে সে অনেকগুলি উল্কির ছবি আঁকাইয়াছে, গায়ের রঙ এত কালো যে আর একটু কালো হইলে উল্কিগুলি দেখা যাইত কি না সন্দেহ।

কোনদিকে দৃকপাত নাই, স্বয়ং বিধাতার সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা করিতে করিতে তাহার প্রচুর আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছে। আসিয়াই হাঁকিল, 'গিন্নিমা কুথায় গো?'

মা উপর হইতে নামিয়া আসিলেন।

দাই বলিল 'এস্লাম তো গিন্নিমা, উদিকে যে আবার ফ্যাকড়া বাঁধল।'

মা শঙ্কিতা হইয়া বলিলেন, 'কি আবার ফ্যাকড়া বাঁধল বাছা?'

'হোই ও পাড়ার ভূষণবাবুর মেয়েরও আজ ব্যথা উঠেছে। আমার হাত ধরে কি টানাটানিই না করলে!—দত্তমশায় নিজে, লজ্জায় মরি গিন্নিমা! বললে, তুমি থাকলে বুকে ভরসা পাই রাখীর মা, ভালয় ভালয় খালাস করে দাও পঁচিশ টাকা নগদ আর তোমার যা রোজ বাঁধা আছে দু'টাকা করে—'

একটু নিরুপায় হাসি হাসিয়া দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাই মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মা মুখ ভার করিয়া বলিলেন 'ওইতো বাছা তোমাদের

দোষ। একেবারে শেষ সময়ে মোচড় দিয়ে পাওনা বাড়িয়ে নিতে চাও। দেনা পাওনার কথা তোমার সঙ্গে তো হয়েই আছে কবে থেকে?'

দাই বলিল 'কথা হয়ে থাকলেই কি গরীবের চলে মা! যেখানে দুটাকা বেশী মিলবে আমাদের সেইখানেই নাগতে হবে।'

মার সাংসারিক অভিজ্ঞতাও কম নয়, বলিলেন 'তবে তুমি সেইখানেই যাও বাপু, আমরা অন্য লোক দেখছি। সিধুর বোনকে বলা আছে, ডাকলেই আসবে।'

শুনিয়া ঘরে সুলতার মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল। এমন বিপর্য্যয় ব্যাপার ঘটিবে, বংশধর ভূমিষ্ঠ হইবে, ছেলের বৌ বাঁচিবে কি মরিবে ঠিক নাই, শ্বাশুড়ী তুচ্ছ কটা টাকার জন্য এমন করিতেছেন! যে টাকা তারই স্বামী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার করে! প্রথমেই পাওনা নিয়া গোল বাঁধিলে দাই কি আর মন দিয়া নিজের কর্ত্তব্য করিবে? আর্থিক ক্ষতির প্রতিশোধটা দাই যদি তার উপরেই নেয়?

সুলতার মনে হইল, পরমাত্মীয়ের মৃত্যুকালে এ যেন জীবনের মূল্য নিয়া ধন্বন্তরির সঙ্গে দর কষাকষি করা!

মনে মনে সে স্থির করিয়া ফেলিল দাইকে এক সময় চুপি চুপি জানাইয়া দিবে, টাকার ব্যাপারে তাহার কোন দোষ নাই। দাই যত টাকা চায় সুলতা গোপনে তাহার হাতে দিবে, সে যেন তাহার সমস্ত কলাকৌশল প্রয়োগ করিতে কৃপণতা না করে, এবারের মত সে যেন তাহাকে বাঁচাইয়া দেয়। ভবিষ্যতে—

মা আর মরিয়া গেলেও হইবে না।

বায়স্কোপ নয়, বিকাশ খেলা দেখিতে গিয়াছিল। বাড়ী ফিরিতে তাহার সাতটা বাজিয়া গেল।

কালও যে খেলা দেখিয়া এমনি সময়ে সে বাড়ী ফিরিয়াছিল সে কথা বিকাশের মনে পড়িল না, বিশেষ করিয়া আজকার দিনটিতে দেরী করার জন্য মনে মনে সে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বিরক্তি গোপন করিবার কোন চেষ্টাই সে করিল না।

'আমায় একটা খবর পাঠাতে পারলে না কেউ? কি যে সব ব্যবস্থা তোমাদের!'

মা বলিলেন 'খবর পাঠাবার যখন দরকার হ'ল বাবা, তোর ছুটির সময় হয়েছে। কোথায় তোকে খুজে বেড়াত?'

বিকাশ যেন এই কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিল!

মা আবার বলিলেন 'এই তো গেল আঁতুরে, এখনো কিছুই নয়।'

বিকাশ জামা কাপড় ছাড়িল না, বিরস মুখে জল চৌকীতে বসিয়া রহিল। এখনো কিছুই নয় সত্য, কিন্তু তাহার দুঃখ—অন্য কারণে। সুলতার সঙ্গে একটা কথা বলিবার সুযোগও তাহার হইল না এমন ক্ষতি এ জীবনে আর সম্ভব নয়। ও ঘরে ঢুকিবার আগে তাহার নিকট হইতে শেষ সাহস শেষ সান্ত্বনা সংগ্রহ করিয়া নিবার কি অধীর ভাবেই না জানি সুলতা প্রতীক্ষা করিয়াছিল! তাহাকে এতখানি প্রয়োজন আর কোনদিন একটি সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের জন্যও কি সুলতার হইবে!

সুলতার নির্ভরশীলতার চরম অভিব্যক্তি অগোচরে ব্যর্থ হইয়া গেল ভাবিয়া বিকাশের ক্ষোভের সীমা রহিল না।

ও ঘর হইতে সুলতা বাহির হইবে সম্পূর্ণ নূতন হইয়া, সন্তানের জননী এই পরিচয়ের কাছে তাহার প্রিয়া ও পত্নী সংজ্ঞা তুচ্ছ হইয়া যাইবে। যাক্, তাহা অপ্রিয় নয়, কিন্তু এই মহেন্দ্রক্ষণ সন্নিকট হইলে প্রিয়ার বিবর্ণ কপোলে যে ক্ষুদ্র একটি চুম্বন দেওয়া হয় নাই সে আপশোষ এ জীবনে আর ঘুচিবে না।

সুধাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া বিকাশ বলিল 'বৌদিকে বলগে আমি এসেছি।' সুধা আঁতুর ঘরে ঢুকিল এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিল 'বৌদি জানে।'

জানে! কেমন করিয়া জানিল? সে জোরে কথা বলে নাই, শব্দ করিয়া হাঁটে নাই, তবু খবর পৌঁছিল? বিকাশ চাহিয়া দেখিল ঘরে কি আলো জ্বালা হইয়াছে জানালাটা পর্য্যন্ত ভাল করিয়া আলো হয় নাই। আলোর কার্পণ্যে তাহার রাগ হইয়া গেল। সে ভাবিল, আর আধঘণ্টার মধ্যে ও ঘর যদি ইহারা ভাল ভাবে আলোকিত না করে সে নিজে ডে লাইট ভাড়া করিয়া আনিবে।

'ভেতরে কে আছে রে সুধা?'

'মা, ও বাড়ীর পিসীমা আর দাই।'

'মিনু?'

'দিদির শরীর ভাল নয়, শুয়েছে।'

বিকাশের বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। এ সংবাদ শুভ নয়। মৃণ্ময়ীকে সে ভালবাসে, তাহার জীবন সবদিক দিয়া ব্যর্থ হইবার পর করুণার রসে সে মমতা বাড়িয়াই গিয়াছিল। সুলতার সন্তান-সম্ভাবনার কথা প্রকাশ পাইবার পর তাহার মধ্যে যে ভাবান্তর দেখা দিয়াছিল অন্য কাহারো কাছে ধরা না পড়িলেও তাহা বিকাশের চোখ এড়ায় নাই। আজ হঠাৎ মৃণ্ময়ীর শরীর খারাপ হওয়ায় সবটুকু ইতিহাস অনুমান করিয়া তাহার মন খারাপ হইয়া গেল। সুলতার শুভকর বিপদে একি অমঙ্গলের ছায়াপাত!

জুতা খুলিয়া বিকাশ বারান্দার একপাশে রাখিয়া দিল। জামা খুলিয়া কলতলায় মুখহাত ধুইয়া আবার জল চৌকীটাতেই বসিল। তাহার ভয়ানক ক্ষুধা পাইয়াছে। তামাকের তৃষ্ণাও যেন ক্ষুধার মতই অবুঝ।

আপিস যাওয়ার সময় সুলতাকে সে নারকেল কোরাইতে দেখিয়া গিয়াছিল। তক্তি টক্তি কিছু করিতে পারিয়াছিল কিনা কে জানে! করিয়া থাকিলেও চাহিয়া খাইতে বিকাশের ইচ্ছা হইল না। ক্ষুধার জ্বালা সামান্য, সুলতা অমন কষ্ট পাইতেছে সামান্য ক্ষুধার জন্য সে ব্যস্ত হইবে? সুলতার যন্ত্রণা তাহার খাওয়া না খাওয়ার উপর নির্ভর করে না, খাওয়ার স্বপক্ষে এ ছাড়া আর কি যুক্তিই বা আছে!

রান্নার ভারটা এবেলা সুধার উপরেই পড়িয়াছিল। মুখ তাহার গম্ভীর ও চিন্তা-ভারাক্রান্ত। একটা বাটিতে মুড়ি আর কয়েকটা নারকেল সন্দেশ আনিয়া সে দাদার হাতে দিল, তামাকও সাজিয়া আনিল। তার পর অন্তরঙ্গ বান্ধবীর মত চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল 'বৌদিকে একবার দেখবে দাদা? সারাক্ষণ তোমায় খুঁজছিল।'

বলিতে বলিতে দাদার প্রতি উচ্ছ্বসিত মমতায় কচি মেয়েটার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

বিকাশ বিস্মিত হইয়া বলিল 'থাক।'

'আচ্ছা।' বলিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া সুধা চোখ মুছিতে লাগিল।

দাদার দুঃখ এ বাড়ীতে তাহার চেয়ে কে ভাল করিয়া বোঝে! সারাদিন খায় নাই, কিন্তু কেমন অনিচ্ছার সঙ্গে দাদা মুখে খাবার তুলিতেছিল? হুঁকা হাতে নিয়া কতক্ষণ টান দিতে খেয়াল থাকে নাই? সমবেদনায় সুধার বুক ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ডালে কাটা দিতে দিতে মুখ চোখ বিকৃত করিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া সে উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগ ঠেকাইয়া রাখিল। মনোবৃত্তির এমন ভয়ানক বিপর্যয় তাহার ক্ষুদ্র জীবনে আর দেখা দেয় নাই। প্রথমে এতটা হয় নাই, দাদার ম্লান মুখ ও ছলছল চোখ দেখা অবধি সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

এদিকে তামাক টানিতে টানিতে চারিদিকে চাহিয়া বিকাশ ক্রমাগতই মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেছিল। এই সময়টির যে কল্পনা সে মনে মনে করিয়া রাখিয়াছিল তার সঙ্গে কিছুমাত্র মিল নাই। সে রকম ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি হইতেছে কই? সমস্তই ধীর মন্থর গতিতে ঘটিয়া চলিয়াছে। পুরাতন কাপড় নিতে আসিয়া মা পরম নিশ্চিন্ত মনেই যেন চাকরকে জিনিষের ফর্দ্দ লিখিয়া পয়সা বুঝাইয়া দিলেন, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্বাসগিন্নির সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ করিলেন, রান্না সম্বন্ধে সুধাকে কয়েকটা উপদেশও দিলেন। মৃণ্ময়ী উপরে শুইয়া আছে, পাঁচু বোধ হয় তার ছোট আলোটি জ্বালিয়া অঙ্ক কষিতে বসিয়া গিয়াছে, বেচারীর হাফইয়ারলি পরীক্ষা আসন্ন। আঁতুরের দিক হইতে কাঠকয়লা পুড়িবার একটা গাঢ় গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। দাইয়ের অবিশ্রান্ত বকুনি ও মাঝে মাঝে সুলতার মৃদু কাতরাণি ছাড়া ও ঘরে শব্দ নাই চাঞ্চল্য নাই।

অথচ একি সহজ ও সাধারণ ব্যাপার! পূরা দশটি মাস ধরিয়া বিধাতা স্বয়ং যে ক্লাইম্যাক্সের আয়োজন করিয়াছেন এই কি তাহার উপযুক্ত সমারোহ? বিধাতার খেলায় তাড়াহুড়া নাই বলিয়াই কি সকলে চাঞ্চল্য পরিহার করিয়া কোন মতে ধৈর্য্য ধরিয়া আছে?

এই চিন্তার শেষটা নিয়া মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে করিতে যাহা ঘটিবার ধীরে সুস্থে তাহা ঘটিবেই একথা মানিয়া নেওয়ার মধ্যে যে কতখানি স্বাচ্ছন্দ্য আছে বিকাশ নিজেও সহসা তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

বিকাশের মনে হইল তাহার দুশ্চিন্তা ও সুলতার যন্ত্রণা যে অশেষ নয় এই কথাটাই সে বাড়ীতে পা দেওয়া অবধি স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। রাত বারোটা একটার মধ্যে সব চুকিয়া যাইবে আশা করা যায়। যত কষ্টই পাক সুলতা বারোটা একটা তো একসময়

বাজিবেই আজ! সাতাশ বৎসর ধরিয়া তাহার জীবনে সংখ্যাহীন রাত্রি পোহাইয়াছে আজিকার রাত্রিও পোহাইবে বৈকি!

আগামী কল্যের যে সূর্য্যালোকে সে সন্তানের মুখ দেখিবে, সে সূর্য্যকে মাটির পৃথিবী কয়েক ঘণ্টার জন্য আড়াল করিয়া রাখিয়াছে মাত্র।

জোরে জোরে হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া বিকাশ জামাটা তুলিয়া নিয়া দোতালায় গেল। নিজের ঘরে পা দিয়াই তাহার চমক লাগিল। এখানেও কে যেন অস্ফুটস্বরে কাঁদিতেছে।

ঘরের মেঝেতে আলোটা কমানো ছিল, বাড়াইয়া দিয়া ঠাহর করিয়া বিকাশ দেখিতে পাইল, একটা বালিশ আঁকড়াইয়া বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িয়া পাঁচু থর থর করিয়া কাঁপিতেছে এবং মাঝে মাঝে অস্ফুট শব্দ করিয়া কাঁদিতেছে। তাহার পিঠে হাত দিয়া বিকাশ বলিল, 'তোর আবার কি হল রে পাচু?'

পাঁচু তৎক্ষণাৎ মামাকে সবলে জড়াইয়া ধরিল, বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইয়া বলিল 'ভয় করছে মামা।'

'কেন, ভয় করছে কেন? যা ভয়ের কিছু নেই।'

পাঁচু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলে 'একটা শাকচুন্নী ছাদে বেড়িয়ে বেড়িয়ে চুল বাঁধছিল একটা ভূত এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।'

ছেলেটা ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল, ভয় সে সত্যই পাইয়াছে, কিন্তু কারণটা বিকাশ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। খোলা জানালা দিয়া ছাদের খানিকটা দেখা যায়, অল্প অল্প জ্যোস্নায় মন্দ আলো হয় নাই। ওই ছাদে কিসের উপলক্ষে আজ শাকচুন্নীর আবির্ভাব হইল, তাহার চুল বাঁধা দেখিতে ভূতই বা আসিল কোথা হইতে? কিন্তু যে কারণেই ভয় পাইয়া থাক পাঁচুর ভয় ভাঙ্গানো দরকার।

'তুই ছায়া দেখেছিল পাঁচু। চল্ দেখবি, ছাদে কিছু নেই।'

পাঁচু সভয়ে বলিল 'না মামা!' কিন্তু বিকাশ তাহা শুনিল না, পাঁচুকে শক্ত করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া ছাদের দিকে চলিতে চলিতে হাসিয়া বলিল, 'আমার সঙ্গে যাচ্ছিস, তোর ভয় কিরে? ভূতের আমি কাণ মলে দেব।'

ছাদে গিয়া দেখা গেল শাকচুন্নীর কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। চুল এলাইয়া দিয়া মৃণ্ময়ী অসম্বৃত বেশে ছাদের আলিসার সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া আছে। পায়ের শব্দেও সে মুখ তুলিল না।

'তুই যে এখানে মিনু?'

মৃণ্ময়ী কলহের সুরে বলিল 'কেন এখানে কি আমার থাকতে নেই নাকি?'

বিকাশ বলিল 'মিথ্যে চটিস্ কেন? পাঁচু বড় ভয় পেয়েছে। মাথা ধরা কমাতে তুই ছাতে বেড়াচ্ছিলি, ও মনে করলে আমাদের বাড়ীতে আজ একটা শাকচুন্নী বা এলো। যে ফর্সা কাপড় তুই পরিস্!'

মিনু ঝাঁঝালো সুরে বলিল 'এবার থেকে ময়লা কাপড় পরব। ধোপার পয়সা দিতে তোমার কষ্ট হয় জানতাম না দাদা।'

বিকাশ অবাক হইয়া গেল। মৃণ্ময়ীর মেজাজ সব সময় ভাল থাকে না, কিন্তু এ ভাবে কলহ করাও তাহার স্বভাব নয়। তথাপি সকৌতুকে হাসিয়াই বিকাশ বলিল 'হয়ই ত কষ্ট। তোর জন্য একটা পয়সা খরচ করতেও আমার কষ্ট হয়। কিন্তু তোর ভূতটা কই রে?'

মৃণ্ময়ী চমকাইয়া উঠিল 'ভূত! ভূত কি?'

'পাঁচু দেখেছে। তুই বেড়াচ্ছিলি, একটা ভূত এসে তোকে জড়িয়ে ধরল।'

মৃণ্ময়ী হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া গেল 'তুই দেখেছিস্ পাঁচু? মিথ্যেবাদী হারামজাদা, দেখেছিস্ তুই।'

চাঁদের আলোয় তাহার গায়ে জলের দাগ চকচক করে, চোখ যেন পাগল মেয়ের রাগকরা চোখ। মনে হয়, পাঁচুকে সে আঘাত করিবে। কিন্তু হঠাৎ সে সুর বদলাইল।

'ওটাকে ভূত মনে করেছিল বোধ হয়।'

মৃণ্ময়ী নিজের ছায়াটি দেখাইয়া দিল। একটি হ্রস্ব বাহু বাড়াইয়া ছায়াও তাহার কথায় সায় দিল।

পাঁচুকে নীচে নামাইয়া দিয়া বিকাশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃণ্ময়ী প্রশ্ন করিল "কি ভাবছ শুনি?"

'ভাবছি পাঁচু কেন ভয় পেল। তোকে তো ও কতদিন অন্ধকার ছাতে ঘুরতে দেখেছে, আর আজ এমন জ্যোৎস্না। এও কি সুলতার দোষ রে?'

মৃণ্ময়ী শুষ্কস্বরে বলিল 'তা ছাড়া কি?'

বিকাশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "চল্ মিনু, আমরা নীচে যাই।'

'নীচে গিয়ে কি করব? তোমার বৌএর সেবা?'

'করলে কি তোর পাপ হবে? বড় নির্লজ্জ তুই। বড় ছোট মন তোর।'

এমন কঠিন কথা দাদার কাছে মৃণ্ময়ী জীবনে আর শোনে নাই। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

'বৌকে আমি হিংসা করি না দাদা, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি একটুও হিংসা করি না।' বিকাশ তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না, সংক্ষেপে শুধু বলিল 'তা জানি। চল নীচে।'

রাত নটায় সুলতা চ্যাঁচাইতে আরম্ভ করিয়া দিল, থামিল এগারোটার

সময় ; একেবারে অজ্ঞান হইয়া। বিকাশ সভয়ে বলিল 'ওকি হ'ল ? মরে গেল নাকি ডাক্তার বাবু ?'

ডাক্তার বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিলেন, বলিলেন 'যান মশাই, আপনি রাস্তায় যান।' বিকাশ মিনতি করিয়া বলিল 'আপনি আর একবার দেখে আসুন ডাক্তার বাবু। এমন আচমকা চুপ করে গেল, আমার ভাল বোধ হচ্ছে না।'

ডাক্তার উঠিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট দিলেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে নাই, সুলতা শুধু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

'অজ্ঞান !'

ডাক্তার বিরক্ত হইয়া বলিলেন 'আচ্ছা পাগল তো আপনি ! আপনার জন্য দরকার মত উনি অজ্ঞানও হতে পারবেন না ?'

বিকাশ ছটফট করিতেছিল, এবার বসিল। কোলাহল সমারোহ নাই বলিয়া সন্ধ্যায় সে বিস্মিত হইয়াছিল, এখন আর ও বিষয়ে নালিশ করিবার কিছু নাই। সুলতা একাই সমারোহের সীমা রাখে নাই।

সমস্ত বাড়ীটা অস্বাভাবিক স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সুলতা হয়ত আর শব্দ করিবে না, এ স্তব্ধতা ভাঙ্গিবে একেবারে শঙ্খধ্বনিতে,—যদি ছেলে হয়। শাঁখ সম্ভবতঃ মৃণ্ময়ীই বাজাইবে। শঙ্খ হাতে সেই যে সে প্রহরীর মত আঁতুরের দরজায় বসিয়াছিল, একবারও সেখান হইতে নড়ে নাই।

ভীত পাঁচুর সঙ্গে সুধাকেও শুইতে হইয়াছিল, তাহারা দুজনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গাঢ় অবসাদের গাঢ় ঘুম, কাল সকালের আগে টানিয়া তুলিলেও তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিবে না। সুস্থ সানন্দ-চিত্তে কাল

তাহারা নবাগতকে দেখিবে। কিন্তু আজিকার অভিজ্ঞতা তাহারা ভুলিবে না কোনদিন। জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে খাপ খাইতে হয়ত ক্রমাগত রূপান্তর নিবে, কিন্তু কখনো বিস্মৃতিতে তলাইয়া যাইবে না।

হাটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া দিয়া বিকাশ ভাবিতে লাগিল, সমস্ত জীবন মানুষ দুঃখ ভোগ করে রোগে শোকে কষ্ট পায় কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর তাহার জন্মগ্রহণ। কিন্তু কেন? এই অনাবশ্যক বীভৎসতার মধ্য দিয়া কে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠায়?

খোকা আসিবে আসুক, কিন্তু এ যে বর্গী আসারও বাড়া!

ফাঁদ

সুভদ্রার বাবা একটি নাম করা যাত্রার দলে তবলা বাজাইত। সেই যাত্রার দলেই বার তের বছর বয়স পর্য্যন্ত সুভদ্রা কৃষ্ণ সাজিয়াছিল। কৃষ্ণ সাজিয়া গোপিনীদের পাকা পাকা কথা ও মিষ্টি মিষ্টি গান শোনানো বন্ধ করিতে করিতে সুভদ্রার বয়সটা একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল। অভিনয় বন্ধ করিয়া বাড়ী পাঠানোর কথা তুলিলেই সুভদ্রা ক্ষেপিয়া যাইত। শেষ পর্য্যন্ত বাড়ী অবশ্য তাকে পাঠাইয়া দিতে হইল। বিবাহের আয়োজনও চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণ না সাজিয়াই একসঙ্গে পাড়ার তিনটি ছেলের সঙ্গে প্রেম আরম্ভ করায় কলঙ্কের আর সীমা রহিল না। আরেক-জনের সঙ্গে সুভদ্রা তখন একদিন গেল পালাইয়া। পালানোর সময় কোন আপনজনের কাছে যাওয়ার ইচ্ছা অবশ্য তার ছিল না, কিন্তু পালানোর আগে যার সঙ্গ ছাড়া সে একটা দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না ভাবিয়া-ছিল, দু'দিনের মধ্যে তাকে দেখিলেই তার সমস্ত শরীর রাগে সির্‌সির্‌ করিয়া উঠিতে লাগিল। সঙ্গীটিকে ছাড়িয়া সে অাই গিয়া হাজির হইল দূরের এক গ্রামে তার দিদির কাছে। সেখানে মিষ্টি মিষ্টি গান গাহিয়া সকলকে সে মুগ্ধ করিয়া দিল, আর একটু ভাব করিল ভগ্নীপতির সঙ্গে। সে খেলা ভগ্নীপতি বুঝিত না যে খেলায় শুধু পরস্পরের মন ভুলানো আর সব আছে কিন্তু ধরা দেওয়া নাই। একদিন তাই

অসময়ে জোর করিয়া সুভদ্রাকে জড়াইয়া ধরায় সেটা দিদির চোখে পড়িয়া গেল।

কিছু দূরের একটি গ্রামে মহেন্দ্র নামে ভগ্নীপতির একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সত্ত সত্ত বৌ মরিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সে তার সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ দিয়া দিল।

মহেন্দ্রের সঙ্গে বড় ভাব হইয়া গেল সুভদ্রার। ভয়ানক বদমেজাজী মানুষ মহেন্দ্র, লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড তার শরীর আর শরীরে ষাঁড়ের মত জোর। মেয়েমানুষ যে মোলায়েম জীব এটা বোধ হয় তাঁর জানাই ছিল না। তার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, নিষ্ঠুর পৌরুষ, বীভৎস ভালবাসা আর বাস্তব দরদ যেন সাবান দিয়া আছড়াইয়া কাপড় কাচার মত সুভদ্রার মনের ছেলেমানুষী ময়লা সাফ করিয়া দিল। মনের আনন্দে সুভদ্রা বৌ হইয়া কাটাইয়া দিল কয়েকটা বছর।

তারপর আবার তার মনটা কেমন করিতে লাগিল একটা অজানা কিছুর জন্য। মহেন্দ্রের আলিঙ্গনে শিহরণ জাগার বদলে দম আটকাইয়া আসিতে লাগিল। ধীরে ধীরে তার মনে হইতে লাগিল, রসিক নামে যে রোগা লম্বা ভীরু ছেলেটা মাঝে মাঝে আসে, তার কাছে কি মন কেমন করার ওষুধ আছে? সাধন বৈরাগী নামে যে রূপবান পুরুষটা তার মন ভুলানোর চেষ্টায় নাওয়া খাওয়া ছাড়িয়াছে সে কি তাকে দিতে পারিবে সে যা চায়?

একদিন মাঝরাত্রে সুভদ্রা ধরা পড়িয়া গেল। রাশি রাশি মেঘে ঢাকা আকাশ হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল টিপি টিপি, মোলায়েম একটু ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। সারাদিনের গা-জ্বালানো গরমের পর, একেবারে অচেতন হইয়া ঘুমানো উচিত ছিল মহেন্দ্রের। আগের রাত্রে গরমে সিদ্ধ হইতে হইতেও সে মরার মত ঘুমাইতেছিল, সুভদ্রা কখন উঠিয়া গিয়া কখন

বিছানায় ফিরিয়া আসিয়াছিল কিছুই টের পায় নাই। দু'চারটি রাত্রি বাদ দিয়া তার আগের আরও পাঁচ সাতটি রাত্রেও টের পায় নাই। আজ যে কেন তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

হয় তো জাগিয়াই ছিল, কে বলিতে পারে। একবার ঘুমাইলে মহেন্দ্রের ঘুম সহজে ভাঙ্গে না। উঠিয়া যাওয়ার সময় সুভদ্রা আস্তে তার গায়ে একবার ঠেলাও দিয়াছিল। গায়ে ঠেলা দেওয়ায় যে জাগে নাই কয়েক মিনিট পরে আপনা হইতে তার ঘুম তো ভাঙ্গিবার কথা নয়।

রসিক গায়ে জড়াইয়া আসিয়াছিল ছেঁড়া একটা সস্তা কম্বল। ভয় পাওয়ার অভ্যাস থাকিলে কম্বল জড়ানো সেই চেনা মানুষটিকে দেখিয়া সুভদ্রা হয় তো মূর্চ্ছা যাইত। তার বদলে বর্ষা বাদলের রাত্রে ভালবাসিয়া জ্বালাতন করিতে আসিয়াছে বলিয়া রসিকের হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া তাকে সে টানিয়া নিয়া গেল উঠানের দক্ষিণে ধানের মরাইটার গা-ঘেঁষা ছোট আটচালার নীচে। আটচালার অর্দ্ধেকটা ভরিয়া ছিল চ্যালানো আম কাঠে আর বাকী অর্দ্ধেকটা ভরিয়া ছিল চাষের যন্ত্রপাতি আর ভাঙ্গা গরুর গাড়ীর চাকা হইতে আরম্ভ করিয়া দুমড়ানো কেনেস্তারা পর্য্যন্ত রকমারি জঞ্জালে। তার মধ্যে একটু স্থান করিয়া রসিকের গায়ের কম্বল বিছাইয়া তারা বসিয়াছিল।

তারপর রসিকের বুকে মাথা রাখিয়া ভর্ৎসনার সুরে সুভদ্রা সবে বলিয়াছে, 'আজ আবার কেন এলে শুনি মুখপোড়া?'

আর আবেগ ও আবেদনে কাঁদ কাঁদ গলায় রসিক সবে জবাব দিয়াছে, 'না এসে থাকতে পারলাম না, মাইরি বলছি—'

এমন সময় সেখানে মহেন্দ্র আসিয়া হাজির। দু'জনকেই মহেন্দ্র সম্ভবত খুন করিয়া ফেলিত কিন্তু নাগাল সে পাইল না একজনেরও। লম্বা রোগা বাইশ বছরের ছোকরা রসিক চোখের পলকে উধাও হইয়া গেল

আর স্বভাব খারাপ হইলেও ঘরের বৌ এত রাত্রে ঘরেই থাকিবে জানিয়া মহেন্দ্র ছুটিয়া গেল রসিকের পিছনে। সেই অবসরে গোয়ালের পিছন দিয়া সুভদ্রা পালাইয়া গেল উল্টা দিকে।

সেদিকেও ঘুমন্ত গ্রাম ছিল অনেক দূর অবধি ছড়ানো, কুকুর ডাকিতে-ছিল এদিকে ওদিকে, দূরে শোনা যাইতেছিল চৌকীদারের হাঁক আর জমকালো ভেজা অন্ধকার ভরাট করিয়া খেয়ালের নাগাল ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল ব্যাঙের গানের একটানা আওয়াজ। সোহাগী বৌ রঙীন শাড়ী পরিতে পায় বলিয়া আর রঙীন কাপড় অন্ধকারে সাদা কাপড়ের মত সহজে চোখে পড়ে না বলিয়া নিজেকে সুভদ্রার মনে হইতেছিল ভাগ্যবতী।

গ্রামের শেষ বাড়ীটি শুধু গোটা দুই ভাঙ্গা ঘর, তারই একটিতে এত রাত্রে একজন গান গাহিতেছিল। চেনা চল্‌তি গান, সুভদ্রার নিজের গান। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সে গান শুনিল। খণ্ডিতা রাধার মানভঞ্জনের জন্য তখন সে যে গানটি গাহিত ভাঙ্গা মোটা গলায় ভুল সুরে কথা বদলাইয়া গাহিতেছে বটে অদৃশ্য গায়ক, কিন্তু আবেগ আছে লোকটার।

আবেগভরা লোকগুলি বড় অধীর হয়। ভিজা শাড়ীখানা গায়ে আঁটিয়া গিয়াছে, দেখিবামাত্র হয় তো সাপটাইয়া ধরিবে। ওভাবে কেউ সাপটাইয়া ধরিলে বড় খারাপ লাগে সুভদ্রার। গা বমি বমি করে, দম আটকাইয়া আসে, মনে হয় সে যেন হঠাৎ এগার বছরের মেয়ে হইয়া গেছে আর যাত্রা দলের সেই যুধিষ্ঠির শেষরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের বেশধারী তাকে আসরের খানিক তফাতে একটা ছোট আটচালার নীচে ডাকিয়া নিয়া গিয়া এক হাতে তার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে আর আরেক হাতে তাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে কাছি দিয়া বাঁধার মত।

কিন্তু উপায় ছিল না। এত রাত্রে কে আর তাকে খাতির করিবে। সুভদ্রাকে ভিতরে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। সাধন বৈরাগী মূর্চ্ছা গেল না, দু'চোখ বড় বড় করিয়া গানের বদলে একটা অদ্ভুত আওয়াজ করিতে লাগিল।

সুভদ্রা বলিল, 'আমি গো আমি।'

তখন সাধন বৈরাগী শান্ত হইল। কিন্তু আবার অশান্ত হইয়া উঠিল অল্পক্ষণের মধ্যেই, আনন্দ ও উত্তেজনায়।

প্রথমে সুভদ্রা ভাবিয়াছিল, রসিকের জন্য বোধ হয় একটু মন কেমন করিবে। একটু যেন পছন্দ হইয়াছিল রসিককে তার, দু'একদিন গভীর রাত্রে তার যেন মনেও হইয়াছিল, বেতালা বাঁশীর সুরে জানান দিয়া আজ কি রসিক আসিবে? ভাসা ভাসা একটু রসজ্ঞান ছিল রসিকের, দুপুর রাতের গোপন মিলনে মাঝে মাঝে একটু রসের সঞ্চারও যেন সে করিতে পারিত। কিন্তু বহুদিন ধরিয়া যে ভাবে তার মন কেমন করিয়া আসিয়াছে এখনও তেমনিভাবে মন কেমন করিতে লাগিল বটে, সেটা রসিকের জন্য নয়। স্বামীর ঘরে ফেলিয়া আসা শাড়ী গয়নার মত রসিকও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, এতটুকু আপশোষও সুভদ্রার নাই। রসিক বলিয়া কেউ কি কোনদিন তার মাথার চুলে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে মৃদুস্বরে বর্ণনা করিত আসিবার সময় কোন বাড়ীতে নতুন বর ও বধুর ঘরে বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিয়া একজনকে কি ভাবে আর একজনের পায়ে ধরিয়া সাধাসাধি করিতে দেখিয়া আসিয়াছে, আর শুনিতে শুনিতে তার মনে হইত সে যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে, মুক্তি পাইয়াছে, চাঁচের বেড়ায় ঘেরা চারকোণা জেলখানায় জোরালো দু'টি বাহুর বন্ধন যেন তার আর নাই।

মনটা সুভদ্রার খুঁতখুঁত করে, এরকম হওয়া উচিত ছিল না। রসিকও শেষ পর্য্যন্ত তাকে ফাঁকি দিল, এতটুকু স্থান দাবী করিতে পারিল না তার মনে।

সাধন বৈরাগীর চেহারাটি বড় সুন্দর। প্রথম দিন তাকে দেখিয়াই সুভদ্রা তীব্র বিদ্বেষ আর হিংসা অনুভব করিয়াছিল, মনে হইয়াছিল এই লোকটাই বুঝি জীবনযুদ্ধে তার সবচেয়ে বড় প্রতিযোগী। তারপর সাধনের অনেকদিনের প্রাণপাত সাধনার পুরস্কার স্বরূপ দুর হইতে একটু একটু ভাব করিয়া এতকাল তাকে শুধু সে যন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছে। এখন হঠাৎ একেবারে ধরা দিয়া, অনেক দুরের অচেনা এক সহরে অজানা মানুষের মধ্যে ছোট একটি টিনের ঘরে চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে বসবাস করিবার মত ভয়ানকভাবে ধরা দিয়া, সুভদ্রা দেখিল লোকটাকে সে যেরকম ভাবিয়াছিল সে মোটেই সেরকম নয়। বিদ্বেষ বা হিংসার কোন কারণ নাই, বরং রীতিমত অবজ্ঞা করা চলে। যে জোরালো আবেগ ও উচ্ছ্বাসের আশঙ্কা সে করিয়াছিল সেটা জোয়ারের মত নয়, কলের ফোয়ারার মত। তাও আবার সে উৎসের ভাণ্ডারে সঞ্চয় বড় কম, কলটাও গিয়াছে বিগড়াইয়া, হঠাৎ প্রচণ্ড বিক্রমে উথলাইয়া উঠিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝিমাইয়া পড়ে। শুধু চেহারার টানে অনেক মেয়ে আসিয়া তার রসটুকু শুষিয়া নিয়া গিয়াছে বুঝা যায়। আর রাখিয়া গিয়াছে অহঙ্কার, স্বার্থপরতা আর পাগলামি, যে সব কোনদিন কোন মেয়ের কোন কাজেই লাগে না।

সুভদ্রা হতাশ হইয়া ভাবিল, তাইতো

সে রাত্রে ভিজা রঙীন শাড়ীটি ছাড়িয়া সুভদ্রা সাধন বৈরাগীর গেরুয়া লুঙ্গি আর আলখাল্লা দিয়া নিজেকে ঢাকিয়াছিল। পরদিন পথে তার জন্য দু'সেট শাড়ী ও সেমিজ কিনিয়া গেরুয়া রঙে ছাপাইয়া নেওয়া হইয়াছিল।

তখন দু'জনকে দেখিয়া মানুষের মনে হইয়াছিল, স্বর্গের কোন দেবতা বুঝি একটি অপ্সরাকে সেবাদাসী করিয়া মর্ত্ত্যলোকে বেড়াইতে নামিয়া আসিয়াছেন।

এখানে ওখানে যে ক'টা দিন তারা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, কত লোক সাগ্রহে তাদের সেবা ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে, আশ্রয় দিয়াছে, প্রণামীও দিয়াছে। সুভদ্রার বড় ভাল লাগিয়াছিল সে জীবন। কোথায় যাইবে, কোথায় থাকিবে, কি খাইবে, কে জানে! পথ চলিতে আলস্য বোধ করিলে একটা গরুর গাড়ীকে থামাইয়া উঠিয়া বসিলেই হইল। বাঁধানো বড় সড়কে একদিন দামী একটা মটরগাড়ী দাঁড় করাইয়া দুজনে উঠিয়া বসিয়াছিল, হাওয়ার বেগে চল্লিশ মাইল পথ পার হইয়া গিয়া পৌঁছিয়াছিল সদরে। ক্ষুধা পাইলে ময়রার দোকানে খাবার চাহিয়া খাইলেই হয়, মুদীর দোকানে চাল-ডাল চাহিয়া গাছতলায় রাঁধিলেই হয়, নয়তো গৃহস্থের বাড়ী গিয়া বলিলেই হয়, আমরা আসিয়াছি অন্ন দাও। পয়সা দরকার হইলে, দু'চার দশজনের কাছে চাহিলেই চলে। আশ্রয় তো আছে সর্ব্বত্র, মুচির ভাঙ্গা ঘরে নোংরা মেঝেতে সঙ্গের কম্বল বিছাইয়া চামড়ার গন্ধ নিশ্বাস নিতে নিতেও ঘুমানো যায়, ফুল ও চন্দনের গন্ধভরা মন্দিরের বাহিরে অতিথশালায় জীবন্ত মানুষের ভাপসা গন্ধ নিশ্বাস নিতে নিতেও ঘুমানো যায়, চোর ডাকাত কি খুনির আস্তানা সে বিষয়ে মাথা না ঘামাইয়া আশ্রয় নেওয়া যায় বড়লোক গৃহস্থের বাড়ীতে। গৈরুয়াধারী নরনারীর তো সম্পদ কিছু থাকে না পুণ্য ছাড়া, যা থাকে তার উপরেও তো লোভ করা চলে না, কামনাও করা চলে না সুন্দরী সন্ন্যাসীকে। তাতে পাপ হয়, পাপ করিলে মানুষ নরকে যায়। এমন নির্ভর নিশ্চিন্ত বাধাবন্ধনহীন সহজ সরল জীবন যাপনের সুযোগ থাকিতে মানুষ যে কেন দম আটকাইয়া পচিয়া মরে ঘরের মধ্যে!

কিন্তু সাধন বৈরাগী বলিয়াছে, 'উঁহু, এক যাগায় স্থিতি হয়ে না বসলে কি চলে ?'

সুভদ্রা যদি বলিত খুব চলে, সাধনকেও অবশ্য তা মানিয়া নিতে হইত। কিন্তু মন মরা বিরক্ত আর নিরুৎসাহ সঙ্গী যদি সারাদিন প্যান প্যান করে কাণের কাছে আর মুখ ভার করিয়া থাকে চোখের সামনে, মুক্তিও কি মানুষের ভাল লাগে ? এই সহরে তাই তারা নীড় বাঁধিয়াছে।

সুভদ্রা ভাবিয়াছে, আর যাই হোক, যা খুসী তো করা চলিবে এখানে, পরের কর্ত্তালি, পরের ইচ্ছা অনিচ্ছা বিধি নিষেধ তো তাকে ঘেরিয়া থাকিবে না।

ঘর বাঁধিলে রোজগারের ব্যবস্থা করা দরকার।

সাধন বৈরাগী বলিল, 'ভিক্ষে করা চলবে না কিন্তু।'

কোন রকমে দিন কাটানোর সঙ্গতি সাধন বৈরাগীর ছিল, তার মা রাখিয়া গিয়াছে। জীবনে সে প্রথম একতারা হাতে ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছে সুভদ্রার জন্য। বাহির হইয়াছে অসময়ে, মানুষ যখন ভিখারীকে তাড়াইয়া দেয়। সুভদ্রা তাকে বঞ্চিত করে নাই; নিজেই ভিক্ষা দিতে আসিয়াছে, মুচকি হাসিয়া বলিয়াছে, 'একটা গান কর তো বৈরিগি ঠাকুর।'

সুভদ্রা তাই তামাসা করিয়া বলিল, 'কেন, ভিক্ষে তো তুমি করতে বৈরিগি ঠাকুর ?'

অনেক তামাসাতেই সাধন বৈরাগী পুলকিত হইতে জানে না, এদিক দিয়া মানুষটা সে একটু ভোঁতা।

রোজগারের উপায়টা ঠিক করিল সুভদ্রা। বাড়ীর সামনে রাস্তার ধারে যে হাত তিনেক চওড়া বারান্দাটুকু আছে সেখানে দু'টি দোকান

খোলা হইল, পান-বিড়ি আর তেলেভাজার দোকান। পানবিড়ির দোকানের ভার রহিল সাধনের, তেলেভাজার দোকানের ভার রহিল সুভদ্রার। বাড়ীওয়ালা এবং বাড়ীর আরও তিন ঘর ভাড়াটের কাছে চাওয়ামাত্র অনুমতি পাওয়া গেল।

দোকান খোলার আগের দিন সুভদ্রা বলিল, 'সবাইকে বলে এসো, আজ সন্ধ্যেবেলা কৃষ্ণলীলা গান গেয়ে শোনাব। দোকান যে খুলছি জানানো তো চাই সবাইকে?'

আসর করা হইয়াছিল উঠানে, সন্ধ্যাবেলা সেখানে মানুষ আর আঁটে না। কৃষ্ণলীলার অনেক গান সুভদ্রা জানিত, একাই সে তিন ঘণ্টা আসর জমাইয়া রাখিল। এনেকদিন এ সব গান সে গায় নাই, একটু ভয় তার ছিল গানগুলি ঠিকভাবে গাহিতে পারিবে কি না। কিন্তু আরম্ভ করা মাত্র আগের মতই গানের মোহ কখন যে তাকে মাতাল করিয়া পৃথিবী ভুলাইয়া দিল। এ বাড়ীর একজন ভাড়াটে গিরিন সাউ চমৎকার বেহালা বাজায়, হারমোনিয়াম আর তবলা বাজানোর লোকও সেই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। সুভদ্রা ভাবিয়াছিল, শুধু বসিয়া থাকিয়াই গানগুলি গাহিয়া যাইবে। কিন্তু প্রথম গানের অর্দ্ধেকটাও বসিয়া বসিয়া গাওয়া চলিল না। রাধার কাছে যাওয়ার সময় পথে চন্দ্রাবলী তাকে ধরিয়া নিজের কুঞ্জে টানিয়া আনিয়াছে, রাধার জন্য মন আকুল হইয়া আছে কিন্তু বাহিরে সে চতুরালি করিতেছে চন্দ্রাবলীর সঙ্গে, উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্য ছাড়া এ কি প্রকাশ করা যায়? একটি হাঁটু পাতিয়া বসিয়া সামনে ঝুঁকিয়া পায়ে না ধরিলে কি খণ্ডিতা রাধার কাছে নিবেদন করা যায়, হৃদয়ে যার শুধু রাধার চিহ্ন আঁকা বাহিরের অঙ্গে তুচ্ছ নখচিহ্ন দেখিয়া তার উপর রাগ করা রাধার উচিৎ নয়?

গানের শেষে সুভদ্রা ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। সাধন ঘরে গেল অনেক পরে। খোলা দরজার বাহিরে তখনও মানুষকে চলাফিরা করিতে দেখা যাইতেছে, কলরব শোনা যাইতেছে। সাধন ঘরে আসিবামাত্র সুভদ্রা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া তার সামনে এক হাঁটু মাটিতে নামাইয়া সামনে ঝুঁকিয়া দু'হাতে তার পা ধরিয়া বলিতে লাগিল, 'সত্যি বলছি আমি, তুমি ছাড়া আমি কাউকে জানি না। কোন দিন কোন পর-পুরুষের দিকে আমি তাকাই নি—'

সাধন তার গালে টোকা দিয়া বলিল, 'সত্যি ?'

সুভদ্রা কাতর হইয়া বলিল, 'কেন সন্দেহ করছ ? রসিককে যে মাঝে মাঝে আসতে দিতাম তাও তো তোমার জন্যেই ? মাইরি বলছি, যখন আর সইতে পারতাম না, মনে হত আর একটু'খন তোমায় না পেলে বুক ফেটে যাবে, শুধু তখন একটু সময়ের জন্যে—'

বিছানায় গিয়া এলাইয়া পড়িয়া বলিল, 'উঃ, মাগো ! আমি আর বাঁচব না।'

বেহালা-বাদক গিরীন সাউ-এর বৌ কালিদাসী আসিয়া বলিল, 'খাবে না বউুম দিদি ? কি গানটাই গাইলে বউুম দিদি !'

সুভদ্রা উঠিয়া খাইতে গেল এবং পেট ভরিয়াই খাইল। সে রাত্রে সাধনকে সে আর কাছে ঘেঁষিতে দিল না। কালিদাসী যে সম্মান করিয়া তাকে আজ প্রথম বউুম দিদি বলিয়া ডাকিয়াছে তাতে তার মনে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল।

পরদিন সকালে এত খদ্দের আসিয়া জুটিল যে সাধনের দোকানের অল্প বিড়ি সিগারেট ফুরাইয়া গেল আধ ঘণ্টার মধ্যে, বেগুনি ফুলুরি ভাজিয়া

সুভদ্রা অর্দ্ধেক লোকের দাবী মিটাইয়া উঠিতে পারিল না। সকলেই সুভদ্রার গানের প্রশংসা করিতে চায়, বলিতে চায় যে বেগুনি ফুলুরির এমন স্বাদ তো জীবনে তারা পায় নাই। সঙ্কীর্ণ বারান্দায় উবু হইয়া বসিয়া আর বারান্দার সামনে গোল হইয়া দাঁড়াইয়া সকলে যেন একটি বৈঠক বসাইয়া দিল। লোচন কামার প্রতিমা গড়িতে ওস্তাদ, একটি মাত্র বেগুনি খাইয়া যেন নেশা হইয়াছে এমনি ভাবে সে আধঘণ্টা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল সুভদ্রার বুকের দিকে, আর ভাবিতে লাগিল, একটিবার মুহূর্ত্তের জন্য কাপড়ের নীচে সুভদ্রার স্তন দু'টি দেখিতে পাইলেই সে ঠিক বুঝিতে পারিত তার প্রতিমার বুকের মাটির ঢিপিগুলির চেয়ে ও দু'টি নিটোল বর্ত্তুলাকার কি না। সতীশ গোয়ালা ভাবিতে লাগিল, ইনি নিশ্চয় সাক্ষাৎ ভগবতী। বংশী হালদার সারাদিন মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স আদায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সুভদ্রার গেরুয়া বেশ যেন রোদে ঝলসানো সহরের সুরকির পথের মত চোখে তার ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিতে লাগিল। নটবর একজন বড়লোকের খাতিরের খানসামা, সে ভাবিতে লাগিল, সুভদ্রার সঙ্গে একবার যদি ঘনিষ্ঠতা করাইয়া দেওয়া যায়, কি খুসীই বাবু হইবেন। এই চারজন ছাড়া সকলেই কম বেশী কথা বলিতেছিল, দু'একজন কথা বলিবার চেষ্টায় গিলিতেছিল ঢোঁক।

'এবার আমি রাঁধতে যাই?' বলিয়া এক সময় সুভদ্রা ভিতরে চলিয়া গেল। আবার দোকান খুলিল একেবারে সেই বিকালে। একবেলাতেই দোকানদারিতে তার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। লোকগুলি বড় ভোঁতা, বড় নীরস। বেগুনি ফুলুরি কিনিতে আসিয়া তাকে যেন সকলেই বাঁধিয়া ফেলিতে চায়, তার সাহচর্য্যে ভুলিয়া যাইতে চায় নিজেদের।

বিকালেও খদ্দের আসিল অনেক এবং দিন দিন খদ্দেরের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তখন বেগুনি ফুলুরি ভাজিবার জন্য একজন লোক

রাখিয়া দেওয়া হইল। সুভদ্রা মাঝে মাঝে আসিয়া পাঁচ দশ মিনিট বারান্দায় বসিতে লাগিল আর নিজের হাতে বিক্রী করিতে লাগিল ভাজা জিনিষগুলি। বৈঠক তাই ভাঙ্গিয়া গেল কিন্তু সেজন্য বিক্রী কমিল না। বেগুনি ফুলুরিও কম মুখরোচক জিনিষ নয়।

বৈঠক না বসুক, লোচন, সতীশ, বংশী আর নটবর নিয়মিতভাবে আসে। কেউ সকালে, কেউ বিকালে। সুভদ্রা না থাকিলে গল্প করে সাধনের সঙ্গে, সুভদ্রা আসিলে দু'এক পয়সার বেগুনি কেনে আর দু'একটি কথা কয়।

নটবর একদিন তাকে বাবুদের বাড়ী গান গাহিবার বায়না দিয়া গেল। শুনিয়া লোচন বলিল, 'না, না, অমন কম্মোও কোরো না। ওর বাবু বড় খারাপ লোক।'

সতীশ এবং বংশীও সায় দিয়া বলিল, 'যেও না, বিপদ হবে।'

সুভদ্রা বলিল, 'বিপদ হবে? কিসের বিপদ?' তারপর হাসিয়া বলিল, 'বেশ তো, তোমরা তবে দশটা টাকা দাও আমায়, যাব না। তোমাদেরি না হয় গান শুনিয়ে দেব।'

পরদিন সত্যই তারা দশটা করিয়া টাকা নিয়া হাজির। দশটা করিয়া টাকা দেওয়া তাদের পক্ষে এমনিই সহজ নয়, প্রতিদানে কিছু পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ থাকিলে সেটা আরও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। বুঝিয়া সুভদ্রা খুসী হইল বটে, মন কিন্তু তার ভিজিল না। এসব ফাঁকি সে জানে। সাতদিন একত্র বসবাস করিবার পর সে একটি টাকা বাজে খরচ করিলে এরা প্রত্যেকে তার সঙ্গে রীতিমত ঝগড়া করিবে। তা ছাড়া, এবেলা টাকাটা নিলে ওবেলা এরা একা পাওয়া মাত্র তার হাত ধরিয়া টানিবে। তার চেয়ে নটবরের বাবুর বাড়ী গান গাহিতে যাওয়া অনেক ভাল।

গান কিন্তু সেখানে জমিল না,—সুভদ্রার গান। আসরে ঝালর-বসানো তাকিয়ায় হেলান দিয়া উপস্থিত ছিল শুধু বাবুর কয়েকটি বন্ধু এবং তবলচি ও সেরাঙ্গীর কাছে সহজ অভ্যস্ত ভঙ্গিতে মেরুদণ্ড সিধা করিয়া বসিয়াছিল আরেক জন মানুষ। তার চোখে কাজল আর ছোট নূরটি লালচে রঙে রাঙ্গানো। ধৈর্য্যের প্রতীকের মত সে স্থির হইয়া বসিয়াছিল, আর বাঁ হাতের আঙ্গুলের সন্তর্পণ স্পর্শ ধীরে ধীরে বিলাইয়া দিতেছিল নূরে। সুভদ্রা প্রথম গানটি আরম্ভ করার পরেই বাবু আর তার বন্ধুদের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল কিন্তু এ লোকটি চোখের একটি বাড়তি পলকও ফেলিল না। সুভদ্রা তিনটি গান গাহিবার পর বাবু বলিল, 'এবার তুমি বিশ্রাম কর। ওস্তাদজি, আপনি এবার মেহেরবানি করুন তবে?'

ওস্তাদ এবার একটু হাসিয়া মাথাটি সামনের দিকে সামান্য নীচু করিল।—'সোজা সুরের একটা বাংলা গান গাই?'

'বলেন কি ওস্তাদজি, আপনি বাংলা গান জানেন?' সিগারেটের ধোঁয়া না ছাড়িয়াই সবিস্ময়ে কথাটা বলিয়া বাবুর এক বন্ধু কাসিতে লাগিল।

সুভদ্রা মৃদুস্বরে বলিল, 'জল খান, দু'ঢোক জল খেলেই সেরে যাবে।'

বন্ধুর কাসি থামিলে ওস্তাদ বলিল, 'জানি কিনা সে তো মালুম হবে শুনলে?'

ঠুংরীতে হাফেজের বাংলা ভাবার্থ অনুবাদ। শুনিতে শুনিতে সুভদ্রার মনে হয়, ওস্তাদের অমন সুন্দর ফুলকাটা পাঞ্জাবীর তিন চার যায়গা ছেঁড়া কেন? আরও শুনিতে শুনিতে মনে হয় যে পাৎলা পাঞ্জাবী, ছুঁচ সুতায় সে কি ছেঁড়াগুলি রিপু করিয়া দিতে পারিবে? গান শেষ হইলে তার মনে পড়ে, রিপুর কাজ সে জানে না, যাত্রার দলে যে ছেলেটি

তার রাধা সাজিত সেই যেন কোথা হইতে খুব ভাল রিপুর কাজ শিখিয়াছিল।

ওস্তাদ সুভদ্রাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন লাগল?'

সুভদ্রা নির্ব্বিবাদে বলিল, 'আরেকটা শুনি?'

ওস্তাদের কয়েকটি গান শুনিয়া সকাল সকাল সুভদ্রা বাড়ী ফিরিয়া গেল। বেশ বুঝা গেল, তার গানও বাবুর পছন্দ হয় নাই, তাকেও পছন্দ হয় নাই।

পরদিন ঘোড়ার গাড়ী চাপিয়া ওস্তাদ সুভদ্রার বাড়ী আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'সুভদ্রা গান শিখিবে কি, গান? ভাল ভাল গান?' সেই ফুলকাটা জামা পায়জামা পরিয়াই ওস্তাদ আজ আসিয়াছে, মাথায় শুধু আজ একটি জরি বসানো টুপি, আর চোখের কাজল আরও একটু স্পষ্ট। সুর্ম্মা নয়, কাজল। কালিদাসীর ছেলের কাজলপরা চোখের মতই আশ্চর্য্যরকম কচি কচি দেখাইতেছে ওস্তাদের চোখ।

দেখিয়াই সাধন একটা কুৎসিত প্রশ্ন করিল, 'নটবরের বাবু বুঝি গান শিখাইতে পাঠাইয়াছে ওস্তাদকে?'

ওস্তাদ বলিল, 'তোবা তোবা, নটবরের বাবু আমার কে?'

জগতে এমন বড়লোক কে আছে যে ওস্তাদকে মনিবের মত হুকুম দিবে? বাবু তো শুধু তার সাকরেদ, ওস্তাদের বাড়ীতে যে দু'চারজন গান শিখিতে আসে তাদের সঙ্গে বাবুর তফাৎ এই যে, বাবু গাড়ী পাঠায় আর ওস্তাদ তার বাড়ী গিয়া গান শিখায়।

তারপর প্রতি সন্ধ্যায় সুভদ্রা ওস্তাদের কাছে গান শিখিতে লাগিল। কালিদাসী মুখ ভার করিয়া বলিল, 'মোছলমানের কাছে গান শিখছ বৌদ্দিদি?'

সুভদ্রা বলিল, 'মোছলমান-ই ভাল।'

কিন্তু গান শিখতে ভাল লাগে না সুভদ্রার, কিছুই ভাল লাগে না। দোকানে নিয়মিত কেনা-বেচা চলিতেছে, ভিতরে নিয়মিত ঘর-কন্না চলিয়াছে, নিজেই সে নিজের চারিদিকে সৃষ্টি করিতেছে নিয়মের ফাঁকি আর বন্ধন। যা-খুসী সে করিতে পারে, কিন্তু যা-খুসী করিবে কি? কি আছে যা-খুসী করার? পথে দাঁড়াইয়া উলঙ্গ হইয়া নাচিবে? সহরের পাশে যে নদী আছে তার স্রোতে ভাসিয়া যাইবে? না, বিষ খাইবে?

সাধনকে সে মিনতি করিয়া বলে, 'এখান থেকে পালাই চলো, এঁ্যা? তেমনিভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াব দু'জনে, কি মজাটাই হবে!'

সাধন বলে, 'দূর পাগলি! ঘুরে বেড়ানোতে আবার মজা কি?'

তা ঠিক, ঘুরিয়া বেড়ানোতে হয় তো মজা লাগিবে না। সুভদ্রা এখন টের পাইয়াছে, সাধন বৈরাগীর সঙ্গে ক'দিন পথে পথে কাটানোর আসল মজাটা কি ছিল। কি সুখ ছিল সে ঘুরিয়া বেড়ানোর? কিছুই না। শুধু একটা উত্তেজনা ছিল, প্রতি মুহূর্ত্তের উত্তেজনা, পর মুহূর্ত্তে বুঝি কিছু ঘটিবে, জীবনে কিছু আবির্ভাব ঘটিবে কোন কিছুর। ক্ষণে ক্ষণে তখন সব বদলাইয়া যাইত, মাটির পথের পর আসিত সুরকির পথ, হাট বাজারের পরে আসিত মাঠ, তাড়িখানার পরে আসিত দেব মন্দির, এক জনের কুৎসিত মন্তব্যের পর আসিত আরেকজনের সভক্তি প্রণাম, মুচির ঘরের আশ্রয়ের পর আসিত বড়লোকের বাগানবাড়ীর আশ্রয়। এই পরিবর্ত্তন যেন প্রমাণের মতই আশা জাগাইয়া রাখিত, এ সমস্তের অতিরিক্ত আরও একটা নতুনত্ব নিশ্চয় আসিবে। সুভদ্রা কৃতার্থ হইয়া যাইবে, আর তার মন ছটফট করিবে না, উল্লাসে গদগদ হইয়া সেই নতুনত্বকে বরণ করিয়া বলিবে, এতদিন আসোনি যে বড়, আচ্ছা খামখেয়ালী নিষ্ঠুর মানুষ তো তুমি?

মানুষ? সে নতুনত্ব কি তবে মানুষ সুভদ্রার? ফাঁপরে পড়িয়া

সুভদ্রা এদিক ওদিক তাকায়। কত মানুষ চলিতেছে পথ দিয়া, সকলেই একরকম, দেহকাণ্ডের সঙ্গে দু'টি হাত আর পা আঁটা, এবং উপরে একটা মাথা বসানো। কোন নতুনত্ব তো নাই এদের মধ্যে। এদের মধ্যে যাকেই সে বরণ করুক, মুখে হাত চাপা দিয়া সে শুধু তাকে জড়াইয়া ধরিবে। সে যা চায়, কি চায় তা অবশ্য সে জানে না, কিন্তু যা সে চায় মানুষের মূর্ত্তি ধরিয়া আসিলে তো তার চলিবে না।

সুভদ্রার মনে তাই সন্দেহ জাগিয়াছে, সাধনের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে আর ভাল লাগিবে কিনা। জ্ঞান বাড়িয়াছে, প্রত্যাশার উত্তেজনাটুকু পর্য্যন্ত হয়তো এবার জুটিবে না।

কিন্তু ওস্তাদের সঙ্গে যদি নিরুদ্দেশ যাত্রা করে? কাছাকাছি গ্রাম আর সহরে ঘুরিয়া বেড়ানোর বদলে যদি আজ যায় দিল্লীতে আর কাল যায় বোম্বায়ে এবং তার পরদিন যায় দিল্লী বোম্বায়ের মত সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আরও যে সব জায়গা আছে, যার নামও সে কোনদিন শোনে নাই?

কদিন পরে তাই গেল সুভদ্রা, তবে দিল্লী বা বোম্বায়ে নয়, সাত সমুদ্র তের নদীর পারের অন্য কোন যায়গাতেও নয়। সুভদ্রার অত পয়সা কই? ওস্তাদ গরীব মানুষ। তাই ক'দিন এখানে ওখানে ভাসিয়া বেড়াইয়া দু'জনে কলকাতা সহরে আসিয়া ঠেকিয়া গেল। তবে ওস্তাদ ভরসা দিয়া বলিল, তাতে কি আসে যায়? যেখানে খুসী যাওয়ার সাধ মনে থাক, যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে যেখানে খুসী যতদিন খুসী দিন কাটিয়া যাক, একদিন তো তারা যাইবেই যাইবে। তার বেশী আর কি চাই মানুষের? যাওয়ার চেয়ে যাওয়ার আয়োজন তো তুচ্ছ নয়, মনটাই তো যায় মানুষের মাটির পৃথিবীর বুকে এখান হইতে ওখানে! নাই যদি যাওয়া হয় এখানকার ঘরবাড়ী যানবাহন লোকজন দেখার বদলে ওখানকার

ঘরবাড়ী যানবাহন দেখিতে; এখানকার বালি পাথর সবুজ ঘাসে হাঁটার বদলে ওখানকার বালি পাথর সবুজ ঘাসে হাঁটিতে, একটা যাত্রা তো একদিন তাদের সুরু করিতেই হইবে, অজানা অচেনা দেশের উদ্দেশে. সব যাত্রার চরম একটা যাত্রা ?

তা বটে। সজোরে ওস্তাদকে জড়াইয়া ধরিয়া সুভদ্রা বলে, 'তবে তাই চলো ওস্তাদ, সেখানেই আমরা যাই। তুমি আমার গলাটা টিপে ধরো, আমি তোমার গলাটা টিপে ধরি।'

ওস্তাদ কি বলিতে যায়, বাঁ হাতটি আলগা করিয়া সুভদ্রা তার মুখে চাপা দেয়। দেহের ভারে মুসাফিরখানার ছেঁড়া নোংরা মাদুরের বিছানায় তাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া তার বুকের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়ে।

নরম কোমল হাতটি মুখ হইতে সরাইয়া স্ফূর্ত্তির সঙ্গে ওস্তাদ বলে, 'বহুৎ আচ্ছা, মেরাজান! কেয়াবাৎ!'

সুভদ্রা আবার তার মুখে হাত চাপা দেয়।

শেষরাত্রে ওস্তাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাদের দু'জনের বড় পুঁটুলিটি খুলিয়া সুভদ্রা তার শাড়ী-সেমিজের একটি ছোট পুঁটুলী করিতেছে।

মুখ ফিরাইয়া ওস্তাদকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া সুভদ্রা বলিল, 'পালাচ্ছি ওস্তাদ। চুপিচুপি পালাচ্ছিলাম, তুমি জাগলে কেন ?'

ওস্তাদ বাজে কথা কিছু বলিল না, ব্যস্ত হইল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

'সেখানে ফিরে যাবে ?'

'দূর! ফিরে গেলে সাধন বৈরাগী রক্ষা রাখবে আমার ? যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব।'

ওস্তাদ উৎসুক হইয়া বলিল, 'বেশ তো, চলো না আমিও সাথে যাই ? পিছে পিছে যাব, খুশ হলে কাছে ডাকবে, নয়তো ডাকবে না ?'

সুভদ্রা মাথা নাড়িয়া বলিল, 'উঁহু, এবার একা পালাব ওস্তাদ। পুরুষকে সঙ্গে নেব না। পুরুষ জাতটাই বড় খারাপ, কেবল জড়িয়ে ধরে।'

ওস্তাদ মাথাটা সামনে একটু হেলাইয়া সায় দিল, মুখে কিছু বলিল না। বাঁ হাতে সন্তর্পণে নিজের ছোট লালচে নূরটিকে আদর করিতে লাগিল। একাই যাইতেছে বটে, তবে একা সে থাকিবে না, ওস্তাদ তা জানে। পুরুষমানুষ একা থাকিতে পারে না, ও তো মেয়েমানুষ। একজন কেউ আসিবেই, সুভদ্রা নিজেই যাকে জড়াইয়া ধরিবে, আর ছাড়িবে না। আর সেই একজন যদি কখনো আনমনে জড়াইয়া ধরিতে ভুলিয়া যায় চোখে সুভদ্রার জল আসিবে, রাগে সে ফোঁস্‌ফোঁস্‌ করিতে থাকিবে।

সুভদ্রার পুঁটলি বাঁধা হইলে ওস্তাদ একটি প্রস্তাব করিল। চুপি চুপি যখন পালানো গেল না, বাকী রাতটুকু বসিয়া গল্প করিলে হয় না, ভোরবেলা সুভদ্রা চলিয়া যাইবে ? ভোর হইতে বেশী বাকী নাই।

'তুমি জ্বালালে ওস্তাদ।'

সুভদ্রা কাছে অসিয়া বসিল। গল্প তেমন জমিল না। একটিবার তাকে জড়াইয়া ধরার জন্য মনটা ওস্তাদের আঁকুপাঁকু করিতেছিল। টের পাইয়া সুভদ্রাও প্রতীক্ষা করিতেছিল, কখন ওস্তাদ একটু ভয়ে ভয়ে তার হাত ধরিয়া মৃদু সলজ্জ হাসির সঙ্গে চোখে চোখে চাহিয়া নীরবে জড়াইয়া ধরিবার অনুমতি চাহিবে। বাহিরে ভোর হইয়া আসিল, রাস্তার আলো নিভিয়া গেল, ওস্তাদ কিন্তু কিছুই করিল না।

তখন সুভদ্রা নিজেই বলিল, 'একবারটি জড়াবে না ওস্তাদ ? শেষ বারের মত ?'

ওস্তাদ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না'।

বেশ বুঝা যায়, ধৈর্য্য আর সংযমের তলে চাপা পড়িয়া ভিতরের উত্তেজনা ওস্তাদকে থরথর করিয়া কাঁপাইয়া দিতেছে, দম আটকানো উদ্বেগে নিঃশ্বাস পড়িতেছে ছোট ছোট। ক'দিন কাজল পরা হয় নাই, তবু কাজলের একটু আভাস ওস্তাদের চোখে পাওয়া যায়। আশা, হতাশা, ঈর্ষা, উদারতা, রাগ, দুঃখ, অভিমান, ক্ষমা ও ত্যাগের ভাব মিশিয়া তার মুখে প্রলেপের মত মাখা হইয়া গিয়াছে, আর চোখ দুটি যেন পলকে পলকে বদল করিয়া ওই ভাবগুলি এক একটি বাছিয়া বাছিয়া স্পষ্ট করিয়া তুলিতেছে।

সুভদ্রা চিন্তিত হইয়া বলিল, 'তুমি সত্যি জ্বালালে ওস্তাদ। যাবি না নাকি?' একটু ভাবিয়া সে আবার বলিল, 'না পালাই, তোমার সঙ্গেও আমার বনবে না।'

ওস্তাদের চোখের ঔৎসুক্য নিভিয়া গেল, আটকানো নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। বাহিরের আলো আরেকটু স্পষ্ট হইয়াছে। সুভদ্রা চলিয়া গেল, ওস্তাদ আর একটি কথাও বলিল না। শেষ চেষ্টা কাজে লাগিল না, আর কি বলিবার আছে? এখন আপনা হইতে ফাঁদটি খসিয়া গিয়াছে ভাবিয়া খুসী হওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। কিন্তু সে চেষ্টা করিতে গিয়া ওস্তাদ দেখিল, ফাঁদ খসিয়া গেলেও ফাঁদে পড়া বেকুব প্রাণীর মতই ছটফট্ না করা অসম্ভব।

ভাঙা ঘর

আকাশ ভাঙা বর্ষার মধ্যে আমাকে পথহারা পথিক হিসাবে কল্পনা করতে হবে। পথ দিয়ে হাঁটছি না মাঠ দিয়ে হাঁটছি মাঝে মাঝে তাও ঠিক রাখা অসম্ভব হয়ে উঠছিল। কারণ, জলের নীচে পথ আর মাঠ একাকার হয়ে গিয়েছে। পথটাও অবশ্য ছিল নামেই পথ, মাঠের বুকে পায়ে পায়ে গড়ে ওঠা একটা রেখা। তবু, সে রেখা ধরে চলবার একটা সুবিধা থাকে যে শেষ পর্য্যন্ত লোকালয়ে পৌছানো যায়, অন্ধের মত আধ হাত জলে ছপ্-ছপ্ পা ফেলে যেদিকে খুসি চলতে থাকলে ডোবা পুকুরে পড়বার সম্ভাবনা থাকে বেশী এবং শ্মশানে বা জঙ্গলে গিয়ে হাজির হবার সম্ভাবনা থাকে তার চেয়ে কিছু কম।

তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে কোন লাভ নেই, সমস্ত রাত বৃষ্টি না ধরলে সমস্ত রাত্রিটাই তার ফলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে হয়। তাই, আন্দাজে এগিয়ে চলছিলাম। সামনে অথবা পিছনে, তা বলতে পারব না।

এমনিভাবে চলতে চলতে ভাঙা ঘরখানার সন্ধান পেলাম। আকাশ অবশ্য মাঝে মাঝে আলো সরবরাহ করছিল, সেই আলোতে চোখে পড়ল খড় অথবা শণের প্রকাণ্ড একখানা কাঁচা ঘর ভেঙে পড়ে আছে। আশে পাশে আর ঘর না দেখে একটু বিস্ময় আর বিরক্তি বোধ করলাম।

এক ভিটায় এত বড় একখানা ঘর তুলে সাধারণতঃ কেউ বাড়ী করে না, চার ভিটায় না হোক্ এবং প্রত্যেক ভিটায় এত বড় না হোক্, অন্ততঃ তিন ভিটায় তিনখানা ঘর তোলা হয়। বিদ্যুৎ চমকাবার প্রতীক্ষায় চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, এটা কি তবে গৃহস্থের বাড়ী ছিল, না কোন বিশেষ প্রয়োজনে কোন একদিন মাঠের মাঝখানে কেউ একখানা ঘর তুলেছিল, তারপর প্রয়োজন শেষ হয়ে যাওয়ায় ঘরখানা মুখ থুব্ড়ে পড়ে যাওয়াতেও কেউ খেয়াল করেনি? কিন্তু তাহ'লে তো চারিদিকে আগাছার জঙ্গলের মাথা তুলবার কথা।

ভাঙা ঘরের পাশ কাটিয়ে একটু এগিয়ে যাবার পর এ সমস্যার মীমাংসা হ'য়ে গেল। বাড়ীটা যে গৃহস্থের, চার ভিটাতে সে চারখানা ঘরই তুলেছিল বটে। ভাঙা ঘরের দু'পাশের ভিটায় আরও দু'খানা ঘর ভেঙে পড়ে আছে এবং বিপরীত দিকের ভিটায় দাঁড়িয়ে আছে ছোট একখানা ঘর। প্রথম ভাঙা ঘরখানার কাত হ'য়ে পড়া প্রকাণ্ড চালাটার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকায় এতক্ষণ চোখে পড়েনি। এবার সহজেই বুঝতে পারলাম এতক্ষণে বাড়ীর ভিতরের অঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছি, যে অঙ্গনের অর্ধেকের বেশী দখল করেছে পাশের ভিটার ভাঙা ঘরখানা। একটু দ্বিধা করলাম। তিনখানা ঘর—বড় আর ভাল তিনখানা ঘর—ভাঙা; দাঁড়িয়ে আছে শুধু টিনের চালের ছোট ঘরখানা, সামনে যার একটু রোয়াক পর্যন্ত নেই। ওখানে আশ্রয়ের খোঁজ করার চেয়ে গাছতলায় নিরাশ্রয় হ'য়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়াই কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না?

যা কিছু দেখছিলাম, সমস্তই কয়েক মিনিট পরে পরে চোখের পলকে —প্রায় না দেখারই সামিল। তাই বুদ্ধির ওপর বেশী নির্ভর না করে এগিয়ে গিয়ে বন্ধ ঝাঁপের দরজা ঠেলে গলা ফাটিয়ে ডাকলাম, 'কে আছেন? ও মশায়! শুনছেন?'

ভয়ার্ত পুরুষ কণ্ঠে সাড়া এল : 'কে ?'.

প্রথমে বল্লাম, 'আমি।' তারপর সংক্ষেপে বুঝিয়ে বল্লাম যে পথ-হারানো একজন পথিক—ভদ্রলোক। ঝাঁপে কাণ লাগিয়ে ভিতরের শব্দ শুনবার চেষ্টা করছিলাম, চাপা মেয়েলি গলার প্রশ্ন শুন্‌তে পেলাম : 'খুল্‌বে ? যদি চোর ডাকাত হয় ?' চাপা পুরুষ গলার জবাব শুনলাম : 'চোর ডাকাত হ'লে কি ঝাঁপটা খুল্‌তে পারবে না ?'

একটু পরে ঝাঁপ খুলে গেল, সন্তর্পণে ভিতরের অন্ধকারে এক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভিজা জামা-কাপড়ের জলে সমস্ত মেঝে ভাসিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল না। ঘরের ভিতরের ভাপ্‌সা গরম আর গন্ধে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। আমার মনে পড়ে গেল, অনেকদিন আগে একবার একটা মালগুদামে কয়েক ঘণ্টা আটক পড়েছিলাম, সেই কয়েক ঘণ্টা সময় নিশ্বাস নিতে আমার ঠিক এই রকম কষ্ট হয়েছিল আর ঠিক এই রকম অকথ্য অস্বস্তির সঙ্গে মনে হয়েছিল আমারই পেটের ভিতরের সিক্ত উষ্ণতা বাইরে এসে চারিদিক থেকে আমার সর্বাঙ্গে মাখা হ'য়ে যাচ্ছে।

কালিপড়া একটা লণ্ঠন জ্বলবার পর টের পেলাম, ঘরে অনেকগুলি নানাবয়সী মানুষ বাস করলেও এটাকে মালগুদামও বলা চলে। তবে পৃথিবীর কোন মালগুদামেই এত রকমের বিভিন্ন আর বিচিত্র মাল থাকে কিনা সন্দেহ। ঘরে আর তিলধারণের স্থান নেই। ঘরের অর্ধেক জুড়ে আছে সেকেলে একটা খাট আর একেলে চৌকী, খাটের ছেঁড়া ময়লা বিছানায় শুয়ে আছে একগাদা ছেলেমেয়ে। চৌকীতে গোটা দুই তোরঙ্গ, পিতল ও মাটির হাঁড়ি-কলসী, বস্তা বাঁধা লেপ, কাপড়-জামার পুঁটুলি এবং সাধারণ গৃহস্থের ঘরকন্নার অসংখ্য টুকিটাকি জিনিষ। কেরোসিন কাঠের একটা টেবিলের অর্ধেকটাতে ছেলেদের স্কুলের ছেঁড়া বই-খাতা,

বাকী অর্ধেকটাতে শিশি-বোতল, টিনের কৌটা, কাগজের ঠোঙা—ইত্যাদি। একদিকের বেড়ার গায়ে কাঠের থামে ঠেসান্ দেওয়া একটা পুরাণো ভাঙা সাইকেল। গোটা চারেক রঙচটা লোহার আর গোটা দুই বেতছেঁড়া কাঠের চেয়ার, একটা পায়া ভাঙা টুল আর সাত আটটি ছোট বড় কাঠের পিঁড়ি প্রভৃতি বসবার সরঞ্জামেরও অভাব নেই। একখণ্ড তক্তার উপরে বোধ হয় তিনটি চালের বস্তা, কাছেই তরকারীর ঝুড়ি। চৌকীর তলে অসংখ্য আবছা জিনিষপত্রের একপাশে মস্ত একটা বঁটির ফলা চকচক করছে। খাটের তলাটাও জিনিষে ঠাসা, কিন্তু সেখানে বোধ হয় নিজেকে ঘোষণা করতে পারে এরকম ঝকঝকে কিছু নেই। এক কোণে পুরাণো ভাঙা জিনিষপত্রের স্তূপ—আবর্জনার সামিল। অন্য কোণে বিরাট একটা কাঠের সিন্দুক, ছোটখাট একটা চৌকীর সমান। সিন্দুকের উপরে বিছানা পাতা, বিছানায় বসে আছে বছর পঞ্চাশেক বয়সের শীর্ণ-দেহ একটি লোক। দুয়ারের কাছে একটু স্থান ছাড়া মেঝে আর চোখে পড়ে না, যে জায়গাটুকুতে জিনিষ নেই সেখানে বিছানা পাতা হয়েছে। কেবল মেঝেতে নয়, টিনের চাল থেকে দড়ি বেঁধে যত কিছু ঝুলিয়ে রাখা সম্ভব তাও রাখা হয়েছে। ঘরের সমস্ত জিনিষের তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়, তা হলে মস্ত এক সম্পন্ন গৃহস্থের শোবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর, আর রান্নাঘরে যত জিনিষ থাকে তার প্রত্যেকটির নাম করতে হয়।

মাথার উপরেও যে জিনিষ ঝুলছে এটা আমাকে আবিষ্কার করতে হল বাধ্য হয়ে। মেঝের বিছানাতেও চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল, তাদের মধ্যে একটি মেয়ের বয়স পনের ষোলর কম হবে না। ছোট ছোট ভাইবোনদের মত পরণের শাড়ীখানাকে সেও একেবারে ত্যাগ করেছে। নজরে পড়ামাত্র চোখ তুলে মাথার উপরে ঝুলানো একটা বেতের ঝাঁপির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। বেতের ঝাঁপি তো ঝুলানো থাকেই

না, এই বয়সের মেয়ে দম আটকানো গরমেও ঘুমের মধ্যে অঙ্গের আবরণ ঘুচিয়ে দেয় না।

সাত আট মাসের একটি শিশুকে কাঁখে নিয়ে যে মহিলাটি কালিপড়া লণ্ঠন জ্বালিয়েছিল দরজার ঝাঁপও বোধ হয় খুলেছিল সে-ই, কারণ সিন্দুকের উপরের বিছানা ছেড়ে লোকটি যে নীচে নামেনি বুঝতে কষ্ট হয় না। এতক্ষণ উবু হয়ে বসে সে বোধ হয় আমাকেই দেখছিল, এবার মহিলাটিকে উদ্দেশ করে বলল, 'দেখেছ? হারামজাদি মেয়ের কাণ্ডখানা দেখেছ?'

মহিলাটি মেঝের পাতা বিছানার কাছে এগিয়ে গেল নীরবেই কিন্তু মেয়েটির গালে একটা চড় বসিয়ে দিল সশব্দে। চড়ের শব্দ না শুনলে আমি হয় তো ঝাঁপি থেকে চোখ নামাতাম না। আর্তনাদ করে জেগে উঠে মেয়েটি কাঁদবার উপক্রম করছিল, মহিলাটির উদ্যত চড় দেখে কান্না বন্ধ করে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। দৃষ্টি দেখেই বোঝা যায় ঘুম তার তখনও ভাঙেনি, আরও বোঝা যায় যে মস্তিষ্কের যে অঞ্চলটিতে জীবনের সাড়া ওঠে সেখানটা তার খুঁতধরা। মহিলাটি পায়ের তলা থেকে শাড়ীখানা কুড়িয়ে এনে তাকে ঢেকে দিতে গেল কিন্তু ততক্ষণে সচেতন হয়ে ওঠায় নিজেই সে কাপড়টিকে ছিনিয়ে নিয়ে চোখের পলকে নিজেকে ঢেকে ফেলল।

'মরণ হয় না তোর?'—ঘোমটার ভেতর থেকে মহিলাটির তীব্র চাপা ধমক শুনতে পেলাম।

আমি এদিকে ভিজা জামা কাপড়েই দাঁড়িয়ে আছি আর জল ঝরে ঝরে পায়ের তলায় জমা হচ্ছে। এ কোন্ দেশী আতিথ্য? আমাকেই কি বলতে হবে, ভিজা কাপড় ছাড়বার জন্য আমাকে একখানা কাপড় দেওয়া দরকার?

'এই বিষ্টির মধ্যে এত্‌রাত্রে মশায় এদিকে—?' সিন্দুকের ওপর থেকে প্রশ্ন এল।

আমি বললাম, 'আপনাদের এখানে তো জায়গা হওয়া মুস্কিল, আশেপাশে কারও বাড়ী আছে বলতে পারেন?'

'আছে বৈকি, আমবাগানটার ওপাশে ঢের বাড়ী আছে।'

আটহাতি কিন্তু পরিষ্কার একখানা কাপড় আমার দিকে এগিয়ে ধরে ঘোমটার ভেতর থেকে মহিলাটি বলল, 'কাপড়টা ছেড়ে ফেলুন। আপনি বাড়ী খুঁজে পাবেন না।'

সিন্দুকের ওপর থেকে সায় এল, 'তা বটে, বাড়ী এখন খুঁজে পাওয়া শক্ত বটে। কি বাদলাটাই নেমেছে, বাপ্‌!'

জামা কাপড় ছেড়ে দিতে মহিলাটি সেগুলি চিপে মেলে দিল,—মেলবার স্থান যে ঘরে পাওয়া গেল তাই আশ্চর্য। আমি সিন্দুকে লোকটির পাশে উঠে বসলাম। মহিলাটি খাটে উঠে আমার দিকে পিছন ফিরে বসল, বোধ হয় কোলের শিশুটিকে মাই দিতে।

'খান্‌, বিড়ি খান্‌—'

বালিশের তলা হাতড়িয়ে বিড়ি আর দেশলাই বার করে লোকটি আমার হাতে দিল। বিড়ি টানতে গেলেই আমার কাসি আসে, সিগারেট কেসে সিগারেটগুলিও সম্ভবতঃ ভিজে যায় নি, তবু আমি বিড়িই ধরালাম। খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ির মধ্যে লোকটির মুখের ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করা কঠিন কিন্তু এখন যে গাম্ভীর্য নেমে আসতে দেখলাম গোঁফদাড়ির জঙ্গলেও বোধ হয় তা আড়াল হয় না।

'বাড়ীর কথা জিগ্যেস্‌ করলেন তাই বললাম বাগানের ওপাশে বাড়ী আছে। আপনি যেতে চাইলেও কি আপনাকে যেতে দিতাম মশায়! আজ পর্যন্ত এ বাড়ী থেকে একজন অতিথি ফিরে যায় নি।'

ব্যাখ্যা, কৈফিয়ৎ এবং আত্মসমর্থন। বিড়িতে টান দিয়ে আমি বারেকবার কাসলাম।

'ঘর তিনটে না হয় পড়েই গিয়েছে, তাই বলে জল-ঝড়ের মধ্যে বাড়ীতে লোক এলে তাড়িয়ে দেব! একটা ঘর তো আছে!'

আমিও একটু কৈফিয়ৎ দিয়ে বললাম, 'আহা, তাড়িয়ে দেবেন কেন—ঘরে তো আপনি ঢুকতেই দিয়েছিলেন। তবে, এইটুকু ঘরে আপনাদেরি শোবার জায়গা নেই—'

লোকটি সংক্ষেপে বলল, 'আপনি ওই খাটে শোবেন। ওদের সরিয়ে এখুনি বিছানা ঠিক করে দিচ্ছে—পাঁচ মিনিটের মধ্যে।'

ক'মাইল পথ হেঁটেছি ঠিক নেই, পা আমার টন টন করছিল, গা আমার ব্যথা করছিল, চোখ আমার জড়িয়ে আসছিল ঘুমে। তবু এ প্রস্তাবটিতে সায় দিতে পারলাম না। খাটে যতগুলি ছেলেমেয়ে শুয়ে আছে, ঘরকন্নার জিনিষের মত তাদের গাদা করে রাখবার উপযুক্ত একটু স্থানও ঘরের কোথাও চোখে পড়ল না। বললাম, 'না আমি শোব না। আপনারা শোন্, আমি এই সিন্দুকের ওপরে ওই খানটাতে ঠেস্ দিয়ে বসেই রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব।'

লোকটি অবাক হয়ে বলল, 'তা কি হয় মশায়! আপনি থাকবেন আর আমরা দিব্যি শুয়ে নাক ডাকাব! নরকেও তো আমাদের ঠাঁই হবে না!'

'কিন্তু খোকা খুকীরা যাবে কোথায়?'

'আহা, ওদের একটা ব্যবস্থা হবে বৈকি। তোমরা যে বসেই রইলে চুপচাপ? ভদ্রলোককে কিছু খেতে দাও, বিছানাটা ঠিক করে দাও?'

বড় মেয়েটি মুখের কাছে হাঁটু তুলে দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে জড়সড় হয়ে বসে ছিল আর থেকে থেকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল আমার

দিকে। আমার মত শ্রান্ত ক্লান্ত ঘুমকাতুরে মানুষের দৃষ্টিকেও পীড়ন করে মুখে তার এমন গভীর ক্লিষ্টতার ছাপ। খাটের ওপর থেকে মহিলাটি তাকে ডেকে বলল, 'ছোট একটা থালায় লাড্ডু আর নারকেলের সন্দেশ দে—ছুটো আম কেটে দে।'

আমি হাত জোড় করে লোকটিকে বললাম, 'দোহাই আপনার, এত রাত্রে আর খেতে বলবেন না, মরে যাব। আশ্রয় যে পেয়েছি তাই ঢের—'

লোকটি ব্যথিত কণ্ঠে বলল, 'কিছুই খাবেন না, সামান্য কিছু?'

ঘোমটার ভেতর থেকে উৎসুক কণ্ঠে শব্দ এল, 'সব ঘরেই আছে, হাঙ্গামার কথা মনে করে যেন—'

যে চোখে দশ মিনিট আগে তাকে উলঙ্গ দেখেছিলাম আমার সেই চোখের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে মেয়েটি নিঃসঙ্কোচে আগ্রহের সঙ্গে বলল, 'দিই না?'

আমি ধীরে ধীরে টের পাচ্ছিলাম, এ বাড়ীতে আমিই প্রথম অসময়ের অতিথি নই, হয়তো এই ছোট ঘরখানাতে এরকম অবস্থাতেও আরও অতিথি বাস করে গিয়েছে। কর্তা, গিন্নি, বা মেয়ে, কারও কাছে আমি অনভ্যস্ত বিপজ্জনক আবির্ভাব নই। আমার খাওয়া এবং শোয়ার ব্যবস্থা করার ভাবনায় তলে তলে এদের পাগল হওয়ার উপক্রম হয় নি—এদের পরিচর্যার ভূমিকাটুকুই আমাকে যা করে ফেলার উপক্রম করেছে।

মুখ গম্ভীর করে বললাম, 'পেটের অবস্থাটা ভাল নয়, কিছু খেলে সইবে না।'

তখন কর্তা আর গিন্নি প্রায় একসঙ্গেই সায় দিয়ে বলল, 'তবে থাক্।'

কিন্তু ঘুমন্ত ছেলে-মেয়ে কয়েকটিকে টানা হেঁচড়া করার ব্যবস্থাটা যে কি করে রদ করা যাবে ভেবে পেলাম না। অতবড় একটা খাট

দখল করে আমি একা শুয়ে থাকব আর ওরা কেউ শোবার যায়গা পাবে না! ওদের সঙ্গেই খাটে শোয়া চলে কিনা একবার বিবেচনা করে দেখলাম, কিন্তু সেটাও সম্ভব মনে হল না। কাঠের সিন্দুকের ওপরে বসে খাটের জোরালো গন্ধটা অনুভব করছিলাম, ছেলেমেয়েদের সরিয়ে নতুন চাদর বিছিয়ে দিলেও গন্ধটা অন্তর্ধান করবে বলে ভরসা হল না।

ভেবে চিন্তে বললাম, 'এক কাজ করা যাক আসুন। আপনি খাটে খোকাখুকীদের কাছে শোবেন যান, আমি এখানে শুয়ে থাকি।'

'আপনি কি এখানে শুতে পারবেন মশায়! পা বেরিয়ে যাবে।'

আমি হেসে বললাম, 'একটু পা বেরিয়ে থাকলে কিছু আসবে যাবে না।'

লোকটি গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলল, 'তা'ছাড়া সে বড় হাঙ্গামা।'

অতগুলি ঘুমন্ত ছেলেমেয়েকে তুলে খাট খালি করার চেয়ে এ ব্যবস্থার হাঙ্গামা বেশী হওয়া কি করে সম্ভব কোন মতেই ভেবে পেলাম না। লোকটি অন্যমনস্কভাবে বলতে লাগল, 'কি জানেন, আমাকে তাহলে আপনার ধরাধরি করে খাটে নিয়ে যেতে হবে, উনি একা পারবেন না।'

কাপড় তুলে ধরতে দেখলাম হাঁটুর নীচে থেকে দুটি পা-ই ভদ্রলোকের কাটা।

'সিন্দুকের ওপরে শুতে আমার অসুবিধে নেই, পা বেরিয়ে যায় না। আপনি অবিশ্যি এতক্ষণ ভাবছিলেন, বাড়ীতে অতিথি এলো আর এ ব্যাটা দিব্যি আরাম করে সিন্দুকের ওপর গাঁট হয়ে বসে আছে। কি করব মশায়, নামবার ক্ষমতা থাকলে তো নামব।'

আমি বললাম, 'আহা, আপনার তো বড় কষ্ট। ঘর চাপা পড়ে পা ভেঙেছিল বুঝি?'

'আজ্ঞে না, ট্রেণে কাটা গেছে, দশ বার বছর আগে। ঘর তো আমার ভেঙে পড়েছে গত বছর—সেই যে ভীষণ ঝড় হয়েছিল সাতই আশ্বিন?—সেই ঝড়ে। বড় ঘর তিনখানাই পড়ে গেল, খাড়া রইল শুধু এই ছোট ঘরখানা।'

ঝড়ে বড় ঘরই পড়ে। বড়র পতনের এই বিধানটা চিরদিন নির্দিষ্ট হয়ে আছে। মহিলাটির সাহায্যে লোকটিকে খাটে চালান করে দিয়ে আমি সিন্দুকের ওপর পা গুটিয়ে শুয়ে পড়লাম—বেড়ার দিকে মুখ করে। ঘোমটা টানা মহিলা এবং তার বড় মেয়েটিও তো শোবে। আলোটা জ্বলতে লাগল, সম্ভবতঃ ঘরে অজানা অচেনা মানুষ থাকার জন্য।

শুয়ে শুয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, আমাকে আশ্রয় দেওয়া কি এদের উচিত হয়েছে। আশ্রয় না দেওয়ার অধিকার তো এদের ছিলই, কেবল তাই নয়, আমাকে আশ্রয় দেওয়া কি এদের অন্যায় হয় নি?

অন্ধ ও ধাঁধাঁ

নিদ্রাপুরীর সদর গেটটা প্রত্যহ ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ করিয়া খুলিয়া যায়। ভোরে ঘুম ভাঙ্গিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে বলিয়াই যেন মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষ রাস্তায় জল দিবার গাড়ীতে প্রচুর শব্দের ব্যবস্থাও রাখিয়াছে।

সমস্ত বিছানা হাতড়াইয়া বালিশের পাশে চশমার খোঁজ মিলিল। কাল ঘুমের চোখে খাপে ভরিয়া রাখিতে মনে ছিল না, রাত্রে কখন মাথার চাপে চ্যাপ্টা হইয়া গিয়াছে। টিপিয়া টিপিয়া ডাঁটগুলি যথাসম্ভব সোজা করিয়া চশমা নাকে লাগাইয়া সে উঠিয়া পড়িল। মন্দ হয় নাই। অস্বাভাবিক চাকচিক্যে ভোরের আলো একেবারে অপার্থিব হইয়া উঠিয়াছে।

মোটা একটা চুরুট ধরাইয়া হেরম্ব পথের উপরে খোলা বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। ধূলা ভিজাইবার সমারোহ সমাপ্ত করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ী বিদায় নিয়াছে। পথের ওদিকে ছোট গলিটির মুখে দাঁড়াইয়া আছে একটা ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ী।

গলির ভিতরে বোসেদের একতলা বাড়ীটি খালি পড়িয়াছিল, কোন অজ পাড়াগাঁ হইতে তাহার ভাড়াটে আসিল বোধ হয়। গাড়ীর ছাদে যে জিনিষগুলি হেরম্বের চোখে পড়িল গ্রাম্য গৃহস্থের সংসার ছাড়া কুত্রাপি তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। রঙ চটা টিনের তোরঙ্গ, বাক্সহীন স্প্রিংল

রীড্ হারমোনিয়াম ও ময়লা কাপড়ের বোঁচকা হইতে আরম্ভ করিয়া চালের বস্তা, ডালের হাঁড়ি, মসলা রাখা টিন, ঝুড়ি ভরা কড়াই, খুন্তি হাতা প্রভৃতি রান্নার সরঞ্জাম, এক পোঁট্‌লা অর্দ্ধ শুষ্ক পুইশাক এমন কি গোবর মাখা গরু বাঁধা দড়ি পর্য্যন্ত গাড়ীর ছাদে স্থান পাইয়াছে।

ক্ষুদ্র এক টুক্‌রি কয়লাও ইহারা মমতা বশে ফেলিয়া আসে নাই।

ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখের সামনে এ যেন পরম উপভোগ্য দ্রষ্টব্যের আবির্ভাব। সকাল বেলার আলস্য এ হেন উপলক্ষ্য পাইয়া সুমিষ্ট হইয়া উঠিল। মন্থর চিন্তাযুক্ত মন নিয়া স্তিমিত নেত্রে হেরম্ব আরোহীর অবতরণ দেখিতে লাগিল।

প্রথমে নামিল একটি দৈত্য। গায়ের রঙ নিকষ কালো, মাথার চুল ধবধবে সাদা। বয়স বড় কম হয় নাই, কিন্তু যে গ্রামে ইহার বাস তার আশে পাশে ডাকাতি হইলে এখন পর্য্যন্ত পুলিশ সর্ব্বপ্রথমে ইহাকে ধরিয়া নিঃসন্দেহ টানাটানি করে। গায়ের বিবর্ণ খাকী সার্টটা শরীরের চাপে ফাটিয়া যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে, পরণে ছয় হাত মলিন ধুতি, নিজেও সে পাঁচ হাতের কম লম্বা নয়, পায়ে ধুলি-মলিন চটি।

তুচ্ছ মানুষ, দেহের মানুষ। শক্তি যতই থাক, কুরূপের সীমা নাই তবু হেরম্বের দু'চোখে ঈর্ষা ঘনাইয়া আসিল।

কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। এক হাতে গাড়ীর দরজা চাপিয়া ধরিয়া অন্য হাতে সাড়ীর প্রান্ত উঁচু করিয়া (হাঁটুর কাছে একটি লম্বা ক্ষতের দাগ হেরম্বের চোখে পড়িল; বহুদিন পরে মেয়েটির কথা ভাবিতে গেলে এই চিহ্নটি সর্ব্বপ্রথমে তাহার স্মরণে আসিত) এবার যে সন্তর্পণে অবতরণ করিল তাহাকে দেখিলে চোখের পলক বন্ধ হইয়া যায়।

দৈত্যের পিছনে এ যেন অপহৃতা রাজকন্যার আবির্ভাব।

আধ হাত ঘোমটায় মুখ ঢাকা পাছাপাড় কোরা সাড়ী পরা দৈত্য-

বধূর পরিবর্ত্তে ইহাকে নামিতে দেখিয়া হেরম্বের চুরুট টানা বন্ধ হইয়া গেল। দৈত্যকে গাড়ীর ছাদের জিনিষগুলির কর্ত্তা বলিয়া অনায়াসে ভাবা যায়, কিন্তু এই মেয়েটির ভর্ত্তা বলিয়া কল্পনা করা চলে কেমন করিয়া? রূপার হাঁসুলিতে হীরার পদকের মত তাহা একান্ত অবিশ্বাস্য!

ভর্ত্তা নিশ্চয়ই নয়,—ভৃত্য। স্বামী গাড়ীতে আছে, এইবার নামিবে। হেরম্ব উগ্র কৌতূহলের সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

নামিল শুষ্ক শীর্ণ এক বৃদ্ধ। ঠিক যে নামিল তাহা নয়, দৈত্য তাহাকে একপ্রকার কোলে করিয়াই নামাইয়া দিল। মেয়েটি তাহার হাত ধরিয়া এক পাশে সরাইয়া দাঁড় করাইয়া দিয়া জিনিষ নামানোর তদ্বিরে ব্যাপৃত হইয়া গেল।

বৃদ্ধ নড়েনা চড়েনা সেইখানে ঠায় দাঁড়াইয়া মাথা কাঁপায়। হেরম্ব বুঝিতে পারিল সে অন্ধ।

অন্ধ! গত রাত্রির জ্যোৎস্নার চেয়ে বিস্ময়কর আলো চারিদিকে খেলা করিতেছে, হাত বাড়াইলে দু'চোখের একটি জীবন্ত তৃপ্তিকে স্পর্শ করিতে পারে, তবু বেচারা অন্ধ! হেরম্ব সভয়ে দেখিল, বৃদ্ধের চোখের পাতার তলে চোখ নাই, আছে চামড়া ছাড়ানো তাজা মাংসের রক্তাক্ত বীভৎসতা! অদৃশ্য জগতের শব্দকে অনুসরণ করিয়া দৃষ্টিহীন গহ্বর দুটি এদিক ওদিক ফিরিতে লাগিল, হেরম্ব অভিভূতের মত তাকাইয়া রহিল।

পরিচয় হইতে বিলম্ব হইল না। জিনিষগুলি নামানো হইলে মেয়েটি কি ভাবিয়া বারান্দার নীচে আগাইয়া আসিল। মধ্যাহ্নের সূর্য্যমুখীর মত উর্দ্ধমুখী হইয়া বলিল, একবার নীচে আসবেন?

যাই, এখুনি যাচ্ছি।

একটু সময় লাগিল। জামাটা গায়ে দিতে হয়, চোখের ও মুখের রাত্রি জাগরণ জনিত ক্লিষ্টতা ধুইয়া ফেলিতে হয়, প্রভা চায়ের জল চাপাইয়াছে তাহাকে এখনই ফিরিয়া আসার আশ্বাস জানাইতে হয়।

বাহিরে গিয়া হেরম্ব দেখিল মেয়েটি পথ ছাড়িয়া রোয়াকে উঠিয়া আসিয়াছে। দু'পাশে প্রত্যেকটি বাড়ীর জানালা খুলিয়া গিয়াছে, কিষণ মুদীর দোকানে ক্রেতাদের মুখ এই দিকেই ফেরানো, পথের কয়েকজন পথিকও হঠাৎ চলিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

মেয়েটি চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল, মৃদু হাসিয়া বলিল, এও দেখছি আমাদের গাঁয়েরি মতন। মানুষ দেখতে মানুষ ভিড় করে।

এতক্ষণ সেও যে ওই কাজই করিতেছিল হেরম্বের তাহা মনে পড়িল না। বলিল, সব ছোটলোক। আপনি বরং ভিতরেই চলে' আসুন। আমার স্ত্রী—

মেয়েটি বলিল, আপনার স্ত্রীকে আর বিরক্ত করব না। আপনার কাছেই আমার একটু সাহায্যের প্রার্থনা। আমার ওই চাকরটার শরীর যত বড় বুদ্ধি তত কম। তাছাড়া বাজার হাট পথ ঘাটও চেনে না। আপনার চাকরকে যদি দয়া করে এক ঘণ্টার জন্য ধার দেন—

সারাদিনের জন্য চাকরকে ধার দিতে স্বীকার করিয়া হেরম্ব বলিল, আপনাদের এবেলার খাওয়ার ব্যবস্থা আমার এখানে হতে পারে না?

মেয়েটি একটু ভাবিল।—না, রান্না আমিই করে নেব। তোলা উমুন কয়লা সব সঙ্গে আছে—অসুবিধা হবে না।

হেরম্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, জোর করা আমার পক্ষে অশোভন। আমার স্ত্রীকে ডেকে আনি। সে পীড়াপীড়ি করতে পারবে।

মেয়েটি হাসিল, তা তিনি করবেন না। আমার সঙ্গে' যে বুড়ো-মানুষটি আছেন ওর জন্যে বিশেষ কায়দা করে' রাঁধতে হয়। আমি ভিন্ন

সে কায়দা কারো জানা নেই। কিন্তু আমরা ক্ষুধাতুর হ'য়ে আছি, মুড়ি চিড়া মুড়কি-যাহোক কিছু জলখাবার আর একটু দুধ যদি পাঠিয়ে দেন—

বৃদ্ধকে নির্দ্দেশ করিয়া হেরম্ব বলিল, উনি কে ?

উনি আমার আত্মীয়, অভিভাবক।

হেরম্ব মনে মনে হাসিল। অভিভাবকই বটে! চিরন্তন গাঢ় অন্ধকারে বসিয়া চক্ষুষ্মতীর সম্বন্ধে কি অভিনব ভাবনাই না জানি ও ভাবে ?

একঘণ্টার জন্য চারককে ধার দিয়া সদ্য-আগতা প্রতিবেশিনীর প্রতি কর্ত্তব্য শেষ করা গেল না। বাড়ীটার সবে সংস্কার হইয়াছিল, চূণ সুরকি, ভাঙ্গা ইট ও নানাবিধ আবর্জ্জনায় এমনি নোংরা হইয়াছিল যে পরিস্কার করিতেই দৈত্য ও হেরম্বের চাকরের সারাদিন লাগিয়া যাইত। হেরম্বই দু'জন কুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বাড়ী পরিস্কারের কাজে লাগাইয়া দিল, নিজের বাড়ী হইতে একটা তক্তপোষ আনাইয়া বৃদ্ধের শয়নের বন্দোবস্ত করিল এবং নিজেই কূয়ার ধারে গোটাতিনেক খুঁটি পুতিয়া কাপড় দিয়া ঘেরিয়া রাধার স্নানের অস্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া দিল। রাধা মৃদু হাসিয়া বলিল, গাঁয়ের মেয়ে, পুকুরে স্নান করি, ভিজা কাপড়ে বাড়ী ফিরি। সহরে এসেই মানুষের দৃষ্টিকে অপমান করব ?

এ অবশ্য প্রকারান্তরে কৃতজ্ঞতা জানানো, কিন্তু হেরম্বের মনে হইল এ ভাবে ঘুরাইয়া বলিবার আরও একটা অতিরিক্ত উদ্দেশ্য আছে। রাধার দৃষ্টিকে অনুসরণ করিয়া সে অবাক হইয়া গেল। ওদিকে দাঁড়াইয়া তীব্র দৃষ্টিতে দৈত্য তাহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছে। দু'চোখে তাহার অকথ্য বিতৃষ্ণা।

হেরম্বকে চাহিতে দেখিয়া দৈত্য সরিয়া গেল।

ও ডাকাতটাকে সঙ্গে এনেছেন কেন ?

রাধা হাসিল, আত্মরক্ষার জন্য। অতখানি অনুগত অন্ধ শক্তি আর কোথায় পাব ?

শক্তির অন্ধতা বিপজ্জনক।

অন্যের পক্ষে হতে পারে, আমার পক্ষে নয়। বিপজ্জনক অন্ধশক্তি পৃথিবীতে আছে বলেই ওকে সঙ্গে এনেছি। নইলে—

কথা সে শেষ করিতে পারিল না। বারান্দার শেষপ্রান্তে কোণের ঘরখানা অন্ধ বৃদ্ধের, সেদিক হইতে কড়া তামাকের দুর্গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। অকস্মাৎ সে-ঘরে এমন বীভৎস একটানা কাসির শব্দ আরম্ভ হইয়া গেল যে হেরম্ব চমকাইয়া উঠিল।

ওকি ? কে কাসে অমন করে ?

রাধা পাংশু মুখে বলিল, আমার সেই অভিভাবক। বলিয়া সে দ্রুতপদে অন্ধের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। হেরম্ব স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওই শীর্ণকায় মুমূর্ষু বৃদ্ধ এমন ভয়ানক শব্দ করিয়া কাসে !

কাসি যেন আর থামিতে চায় না। একটা প্রকাণ্ড বকযন্ত্রের মধ্যে তোড়ে জল প্রবেশ করিবার চেষ্টায় মুহুর্মুহু থামিয়া থামিয়া গর্জ্জন আরম্ভ করিয়াছে। হেরম্বের মনে হইল আর খানিকক্ষণ এভাবে কাসিলে বৃদ্ধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি খসিয়া চতুর্দ্দিকে ছিটকাইয়া পড়িবে।

খানিক পরে দম আটকানোর মত একটা বিশ্রী আওয়াজ হইয়া কাসি থামিয়া গেল। রাধা ফিরিয়া আসিলে হেরম্ব বলিল, এতো দেখছি সাংঘাতিক কাসি ?

রাধার ফ্যাকাসে মুখে ধীরে ধীরে রক্ত ফিরিয়া আসিতেছিল, মৃদুস্বরে সে বলিল, হ্যাঁ, অনেকদিন ধরে' ভুগছেন। ভুগে ভুগেই ওঁর এমন চেহারা হয়েচে, নইলে বয়স খুব বেশী নয়। মোটে চল্লিশ।

হেরম্ব অবাক হইয়া বলিল, কাসির অসুখে মাথার চুল সাদা হয়ে যায় ?

তাইতো গিয়েছে দেখছি। জানেন, ওর চুলের দিকে তাকালে আমার ভয় করে। এমন হঠাৎ সব চুল সাদা হয়ে গেল! তিন চার মাস আগেও সব চুল কালো ছিল। সেই থেকে স্বভাবও বদলে গেছে। কেসে কেসে মরবার দাখিল হয়েছে, তবু তামাক খাওয়া চাই। এমনি পায় না, আজ চাকরের হুঁকো কল্কে খুঁজে নিয়ে—

কি ক'রে খুঁজলেন ?

তাই ভাবছি। চোখ নষ্ট হবার পর থেকে ওর কতগুলি আশ্চর্য্য ক্ষমতা জন্মেছে।

উনি আপনার কে হন ?

সে তো আপনাকে বলেছি। আমার আত্মীয়।

কিরকম আত্মীয় ?

পরমাত্মীয়। বলিয়া রাধা হাসিবার চেষ্টা করিল।

এ বিষয়ে হেরম্ব আর কোন প্রশ্ন করিল না, গম্ভীর হইয়া বলিল, কাসির পক্ষে এ যায়গাটা খুব উপকারী। মাসখানেকের মধ্যে ওর অনেক উপকার হবে।

সেই জন্যেই তো এখানে এলাম। ওর বেঁচে থাকা বড় দরকারী, বড় দরকারী। এই বলিয়া রাধা এমন এক প্রকার রহস্যময় দৃষ্টিতে হেরম্বের মুখের পানে চাহিয়া এত বেশী অন্যমনস্ক হইয়া গেল যে হেরম্বের মনে হইল শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্য নয়, একটা অন্যতম বৃহৎ কারণে অকাল-বৃদ্ধের বাঁচিয়া থাকাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। চেষ্টা করিয়াও সে এই উদ্যত প্রশ্নটাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না ;

বেঁচে থাকা দরকারী কেন ?

অতর্কিতে একটা অতিবড় অপরাধ যেন ধরা পড়িয়াছে, এমনিভাবে চমকাইয়া উঠিয়া রাধা কেমন বিহ্বল হইয়া গেল।

সে আপনি বুঝবেন, আপনাকে আমি বুঝিয়ে দেব। আপনি আজ আমায় একটা ভিক্ষা দিন। ওকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাকে আপনার সাহায্য করতে হবে। করবেন?

হেরম্ব ব্যস্ত হইয়া বলিল, করব বৈকি। নিশ্চয় করব।

পরম আশ্বস্ত হইয়া রাধা বলিল, ডাক্তার বলেন দু'এক বছরের মধ্যে ওর কিছু হবে না। আপনার কি মনে হয়?

আমার মনে হয় উনি সেরে উঠবেন।

না, সে আশা আর নেই। বলিয়া রাধা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

বেলা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সেমিজ খুলিয়া চুল এলাইয়া দিয়া গামছা হাতে রাধা বাহির হইয়া আসিলে হেরম্ব বিদায় চাহিল।

রাধা বলিল, বিকালে ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসবেন।

হেরম্ব হাসিল, কার ছেলে মেয়ে? আমার? কোথায় পাবো!

ছেলে মেয়ে নেই আপনার!

এ যেন অকথ্য, অবিশ্বাস্য, কল্পনাতীত দুঃসংবাদ! হেরম্বের মনে হইল ইচ্ছা করিয়াই গামছাটা ফেলিয়া দিয়া কুড়াইবার ছলে রাধা কয়েক-মুহূর্তের জন্য মুখখানা আড়াল করিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইতে দেখা গেল ওইটুকু সময়ের "মধ্যে" মুখের হতাশাব্যঞ্জক ভাবটা সম্পূর্ণ মিলাইয়া দিতে পারে নাই। একটুখানি ম্লান হাসিয়া বলিল, আপনাকে দেখেই কিন্তু মনে হয়েছিল আপনার ঘরভরা ছেলেমেয়ে। এমন স্বাস্থ্য এমন রূপ এমন প্রতিভার জ্যোতি মুখে চোখে—

রাধা দ্রুতপদে স্নানের ঘেরা স্থানটুকুতে ঢুকিয়া পড়িল।

হেরম্ব খানিকক্ষণ নড়িতে পারিল না। রাধার মন্তব্য খুব বেশী অদ্ভুত ও আকস্মিক তাহা নয়, ছেলে মেয়ে নাই শুনিয়া যে আশ্চর্য্য মুখভঙ্গি সে করিয়াছিল এ মন্তব্যের জন্য তার চেয়ে বিশদ ও সুস্পষ্ট ভূমিকার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য রূপ ও প্রতিভার অপচয়ে রাধা এমন বিচলিত হইল কেন? পরিচয়তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার!

পাতলা কাপড়ের আড়ালে রাধাকে ছায়ার মত দেখা যাইতেছিল, একটুখানি বিদেহী সোণালী আভা। হেরম্ব বুঝিতে পারিল মাথায় জল দেবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া রাধা জলচৌকীতে নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে।

বাহিরের দিকে পা বাড়াইয়া হেরম্বও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

বারান্দা যেখানে বাহিরের ঘরের দিকে দিক্‌পরিবর্ত্তন করিয়াছে সেখান হইতে একটি সুদীর্ঘ কালো ছায়া উঁকি মারিতেছিল, হেরম্বকে চাহিতে দেখিয়া চোখের পলকে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

চলিতে আরম্ভ করিয়া হেরম্বের মনে হইল, এ মন্দ নয়। সমুখে যখন স্বহস্ত রচিত বস্ত্রাবাসে স্বর্ণাভ ছায়া জলজল্ করে পিছনে তখন বিপুল কালো ছায়া নিঃশব্দ প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া থাকে।

বাহিরের ঘরে পা দিতে দৈত্য সোজা দাঁড়াইয়া গম্ভীর আওয়াজে বলিল, সেলাম বাবু।

সেলাম। তুমি মুসলমান নাকি?

গোলাম মোছলমান।

লোকটার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া হেরম্ব পথে নামিয়া

পড়িল। ইহার লোমশ হাতের এক টিপুনিতে গলার অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াইতে পারে কল্পনা করিতে গিয়া কৌতুকানুভূতির পরিবর্ত্তে তাহার গলার মধ্যে খুস্ খুস্ করিয়া উঠিল।

দিন যায় আর হেরম্বের মনে হয় রাধা নিজে যেন ধাঁধা নয়, একটা অদ্ভুত রহস্য তাহাকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতেছে। বায়ুর মতই হয়ত তাহা স্বচ্ছ, কিন্তু ধূলাবালিতে এমনি আবিল হইয়া উঠিয়াছে যে রাধাকে ঝাপ্সা মনে হয়।

জীবনে একটি বিশেষ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বলিয়াই তাহার যতটুকু অভিনবত্ব, নহিলে রূপের হিসাব ছাড়া প্রভার সঙ্গে তাহার পার্থক্য সম্ভবতঃ এতখানি নয়।

বিকালের দিকে প্রভা রাধার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তোমার বর্ণনার সঙ্গে একেবারেই মিলল না। কেমন ভয়ে ভয়ে কথা কইল, খালি এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। তোমার বৌকে দেখে ওর লজ্জা পাবার কি আছে ?

হেরম্ব হাসিয়া বলিল, বোধ হয় কৌতুক। ওকে দেখে আমার বৌয়ের লজ্জা পাওয়া উচিত।

প্রভা ম্লান মুখে বলিল, পাড়ায় যে সব কথা উঠছে কাণে গিয়েছে বোধ হয়।

হেরম্ব হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, পাড়ার লোকের অজুহাত না দিয়ে যেদিন মনের কথাটা স্পষ্ট করে' বলবে সেদিন এ বিষয়ে আলোচনা করব প্রভা।

কিন্তু তুমি হতাশ হ'য়ো না। একদিক দিয়ে ভগবান যে তোমার

বঞ্চিত করেছেন সেইটাই বোধ হয় আর একদিক দিয়ে এবার তোমার কাজে লাগবে।

জামা পরাই ছিল, প্রভার বিস্ময়কে উপেক্ষা করিয়া হেরম্ব বাহির হইয়া গেল। চশমাটা সে বদলাইয়াছে এবং এখন সকাল নয়, অপরাহ্ণ। তথাপি তাহার চোখে পড়ন্ত সূর্য্যালোক বড় অস্বাভাবিক ঠেকিল। এতকাল অলস বৈচিত্র্যহীন জীবনে সে যেন দেখিতে জানিত না, আজ দেখিতে শিখিয়াছে।

রাধা বলিল, আপনাকে আজ চিন্তিত দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ। পাড়ায় নাকি কি সব কথা উঠেছে শুনলাম। আপনি কি মনে করেন আমার আসা যাওয়া কমিয়ে দেওয়া উচিত?

তাহার মুখের পানে চাহিয়া রাধা সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িল, ঠিক বুঝতে পারছি না। এ আমার কঠিন সমস্যা। বিনামূল্যে সুনাম বিলিয়ে দিলে আপনার যে সবটাই ক্ষতি দাঁড়াবে।

আর আপনার?

রাধা করুণভাবে হাসিল, আমার আবার লাভ ক্ষতি! সে হিসাব চুকিয়ে ফেলেছি। কোথা থেকে এসেছি, কোথায় চলে যাব কেউ তা জানে না, কলঙ্ক কিনতে আমার ভয় কি? একটু ভাবিয়া নতমুখে বলিল, কলঙ্ক রটলে বরং আমার সাহায্যই হবে। আমি জোর পাব।

কথাটা হেঁয়ালির মত শোনাইল, কিন্তু হেরম্বের মনে হইল বিন্দুমাত্র বেমানান নয়। রাধা কবিত্ব করিতে বসে নাই, যে রহস্য নিয়া সে জীবনে পদার্পন করিয়াছে তাহাকে অর্থহীন ইঙ্গিতের সাহায্যে ঘনীভূত করিবার ইচ্ছাও রাখে না। শুনিবামাত্র বুঝিতে পারার মত বক্তব্য তাহার নয়।

রাধা আবার বলিল, আপনি আমায় এমন দ্বিধায় ফেলছেন! দশ বছর ধরে মনমরা হয়ে থেকে সেদিন যখন সকাল বেলা আপনার বাড়ীর

সামনে নামলাম, মনে হল এতদিনে আমারও বুঝি কপাল ফিরল। কিন্তু দু'ঘণ্টার মধ্যে এমন কথাই শোনালেন যে প্রদোষের আধ' অন্ধকার আমি আর অতিক্রম করতে পারলাম না। আচ্ছা,—কম্পিত অঙ্গুলে আঁচল জড়াইতে জড়াইতে বলিল, আচ্ছা আপনার বিয়ে হয়েছে কতদিন ?

সাত বছর।

সাত বছর! শিশু যে এলনা সে অপরাধ তবে কার ? লজ্জা করবেন না, বলুন। এ না জানলে আমার চল্‌বেনা।

সেটা এখনও নির্ণীত হয়নি।

নির্ণীত হয়নি! রাধা স্তব্ধ হইয়া গেল।

হেরম্বের চোখে পলক নাই, শিরার রক্ত চলাচলের মাঝখানে একবার একটা উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল আবার তাহা শান্ত হইয়া গিয়াছে। কথা হইতেছিল বারান্দায় বসিয়া, উঠানের একপাশে দৈত্য হাঁসের পালক ছাড়াইতেছিল,—বৃদ্ধের জন্য মাংসের জুস্ হইবে। দেখিতে দেখিতে হাঁসটা কদর্য্য মাংসপিণ্ডে পরিণত হইয়া গেল। হেরম্বের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

প্রাণিহত্যা দেখলে কষ্ট হয়, না ?

হেরম্ব উদাসভাবে বলিল, না।

আশ্চর্য্য! আমারও হয় না। তবে হয়ত আমার যে জন্য কষ্ট হয়—

আমারও সেজন্য কষ্ট হওয়া উচিত ? হেরম্ব মৃদু হাসিল, তা হয়। জন্ম-মৃত্যুর মধ্যেই আমার সীমা, এ চিন্তা সুখদায়ক নয়।

ইহার পর দু'জনে বহুক্ষণ কথা বলিল না। আকাশে বিকাল হইয়াছে, প্রভা যে বৈকালিক জলখাবার সাজাইয়া বসিয়া আছে

বারংবার সে কথা হেরম্বের মনে পড়িতে লাগিল। এবং তাহাতে বিস্ময়ের তাহার সীমা রহিল না। ক্ষুধার সাড়া নাই, প্রভার খাবারের কথা এত করিয়া মনে পড়ে কেন? বিশেষ করিয়া আজিকার এই অপরাহ্ণে, এই রহস্যময়ীর সান্নিধ্যে চিন্তার জটিল পাক খাওয়ায়?

মাংস কাটিয়া দৈত্য উঠিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ হেরম্ব সচেতন হইয়া উঠিল, কড়া তামাকের দুর্গন্ধে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে।

রাধা চকিতভাবে বলিল, তামাকের গন্ধ পাচ্ছেন?

পাচ্ছি। দৈত্য খাচ্ছে বোধ হয়।

রাধা শঙ্কিত হইয়া বলিল, তাকি ও খাবে! বাড়ীতে তামাক টানতে ওকে আমি নিষেধ করে' দিয়েছি।

দৈত্য যে তামাক খাইতেছে না প্রমাণ পাইতে দেরী হইল না। উভয়ের চোখের সামনে উঠান পার হইয়া সে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। রাধা ত্বরিৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

হেরম্ব বলিল, যান কেড়ে নিন গিয়ে। আজ সারাদিন যদি কেসে থাকেন এ তামাকের ধোঁয়া ফুসফুসে গেলে বাঁচবেন না।

রাধা বিবর্ণমুখে বলিল, ক'মাস আগে মরবার ভয়ে ও দিশেহারা হ'য়ে যেত এখন এমনভাবে তামাক খেতে আরম্ভ করেছে কেন হেরম্ব বাবু? এতো নেশা নয়!

না, নেশা নয়। বোধ রোগযন্ত্রণায়—

রোগ যন্ত্রণা? কি জানি কিসের যন্ত্রণা। আমার গা কাঁপছে হেরম্ব বাবু। রাধার মুখ অস্বাভাবিক সাদা হইয়া গিয়াছিল, হঠাৎ সে যেন ভয়ঙ্কর ভয় পাইয়াছে। হতাশ কণ্ঠে বলিল, ও টের পেয়েছে—কি করে ও যেন টের পেয়েছে। নিজে মরে' আমায় তাই মেরে রেখে যেতে চায়।

রাধা অসহায়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল, নড়িবার শক্তি যেন তাহার লোপ পাইয়াছে। প্রথম দিনের কথা হেরম্বের মনে পড়িল,—এমনি বিহ্বলভাবে অন্ধকে বাঁচাইয়া রাখিতে রাধা তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। অধরের ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া সে বলিল, আসুন, পরে শুনব।

ঘরে ঢুকিয়া দেখা গেল তামাকে টান দিবার সুযোগ তখনো অধর পায় নাই, হুঁকা হাতে উঠিয়া বসিবার পরিশ্রমে হাঁপাইতেছিল।

হুঁকা কাড়িয়া নিতে চোখের রক্তবর্ণ গহ্বর দুটি উন্মুক্ত করিয়া অধর বলিল, দুটো টান দিতে দাও রাধা। অনেক কষ্টে ধরিয়েছি। দাও, দাও বলছি আমায় হুঁকো কল্কি!

অমন প্রচণ্ড শব্দ করিয়া কাসিলেও অধর কথা কয় ফিস্ ফিস্ করিয়া। হেরম্বের মনে হইল কথাকে বঞ্চিত করিয়া সে যেন কাসির জন্য শব্দ সঞ্চয় করে।

রাধা বলিল, তুমি মরতে চাও কেন?

চোখের গহ্বর আরও বেশী উন্মুক্ত করিয়া অধর বলিল, আমি বাঁচতে চাইব কেন?

এ প্রশ্নের জবাব নাই, বিছানার পাশে বসিয়া রাধা চুপ করিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত কাণ পাতিয়া থাকিয়া অধর হঠাৎ প্রশ্ন করিল, ঘরে কে নিশ্বাস ফেলছে? কে এসেছে আমার ঘরে? সোজা হইয়া বসিবার চেষ্টার সঙ্গে আন্দাজে হেরম্বের দিকে তর্জ্জনী উদ্যত করিয়া সে যেন অস্ফুট স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, কে ও? চোরের মত আমার ঘরে কে এল?

রাধার ঠোঁট কাঁপিল কিন্তু কথা বাহির হইল না। হেরম্ব নিজের পরিচয় দিতে যাইতেছিল ইঙ্গিতে রাধা বারণ করিল।

অধরের মাথা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, বিছানার চাদরটা দুই হাতের শীর্ণ আঙ্গুলে মুঠা করিয়া ধরিয়া ভীতস্বরে অধর বলিল, ও যেই হোক, ওকে অত জোরে নিশ্বাস্ নিতে বারণ কর রাধা। না হয় তুমি কথা কও।

রাধা মৃদুস্বরে বলিল, উনি আমাদের প্রতিবেশী। তোমায় দেখতে এসেছেন।

অধর যেন এই সংক্ষিপ্ত জবাবটিরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। একমুহূর্ত্তে তাহার সকল উত্তেজনার পরিসমাপ্তি হইয়া গেল। নির্জ্জীবের মত বালিশে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল, আমার ঘরে ওকে কেন আনলে রাধা ? এতো ওর প্রতিবেশীর ঘর নয়! এ ঘরে কথা নেই, হাসি নেই, চোখে চোখে চাওয়া নেই, শুধু আছে অন্ধকার। এ ঘরে উনি হাঁপিয়ে উঠবেন।

পরস্পরের চোখে চাহিয়া দু'জনে অন্ধের কথা শুনিতেছিল, রাধা চোখ নামাইয়া নিল। শান্ত কণ্ঠে বলিল, উনি বুড়ো মানুষ, এ সব অসুখের বিষয়ে অনেক বোঝেন শোনেন, তাই এসেছেন। উনি এলে আমি অনেক ভরসা পাই।

অধর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, অকাল বৃদ্ধের অসুখ বুড়ো মানুষেরা বোঝে না রাধা। তাদের অভিজ্ঞতা নেই।

এই বলিয়া অভ্যস্ত ভাবে প্রথমে দুই হাতে বুক চাপিয়া হাঁ করিয়া নিশ্বাস নিবার চেষ্টায় হাঁপাইয়া উঠিয়া সে কাসিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেকটি কাসির সঙ্গে সমস্ত চৌকী এমন ভাবে নড়িতে লাগিল যে হেরম্ব বুঝিতে পারিল না রাধার সর্ব্বাঙ্গ ঠিক কি কারণে কাঁপিয়া উঠিতেছে।

হুঁকাটা রাধা হেরম্বের হাতে দিয়াছিল। কলিকার আগুন নিভিয়া যায় নাই, পাক খাইয়া খাইয়া তাহা হইতে ধোঁয়া উর্দ্ধে

উঠিতেছিল। হেরম্ব অকস্মাৎ খোলা দরজা দিয়া হুঁকা কল্কি উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য কাসি স্থগিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু একেবারে কমিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনাইয়া আসিল অধরের সঞ্চিত শব্দ তখন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, কাসিতেছে হিক্কা ওঠার মত। কাসির বিরামের অবসরে মাথা উঁচু করিবার চেষ্টায় চোখের গর্ত্ত জলে ভরিয়া উঠিতেছে, সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। প্রথম হইতে রাধার একটি হাত সজোরে চাপিয়া ধরিয়াছিল, এখনো ছাড়ে নাই। যে দুর্নিবার স্রোত আজ তাহাকে মরণের পরপারে ভাসাইয়া নিয়া যাইতে চায় নোঙরের মত রাধা যেন তাহাকে ব্যর্থ করিবে।

দেয়ালে ঠেস দিয়া রাধা মড়ার মত চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে।

দৈত্যের মুখখানা দেখিবার জিনিষ। অত বড় বিপুল দেহে অমন অসীম শক্তি নিয়া সে যে শিশুর মত ভীত অসহায় দৃষ্টিকে চারিদিকে সঞ্চালন করিতেছে অন্ধের যন্ত্রণার চেয়ে তাহা যেন সকরুণ। ওর অল্প পরিমাণ মস্তিষ্কে কি ক্রিয়া চলিতেছে কে জানে? হঠাৎ রাধা বলিল, হেরম্ব বাবু, ওকে বাঁচান। বেশী নয় আর কয়েকটা মাস—শুধু আর কটা মাস ওকে আপনি বাঁচিয়ে রাখুন।

ডাক্তার উপস্থিত থাকিতে তাহাকে এই মিনতি জানানোর মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর একটা ইঙ্গিত ছিল যে হেরম্ব কোন আশ্বাসের বাণী উচ্চারণ করিতে পারিল না।

ডাক্তার গম্ভীর মুখে বলিলেন, ভয় পাবেন না। উনি বাঁচবেন বৈ কি নিশ্চয় বাঁচবেন।

আশ্চর্য্য আশ্বাস, বিস্ময়কর মিথ্যা!

ডাক্তারের মুখের কথা শেষ হইবার এক মিনিট পরেই ভয়ঙ্কর একটা

কাসির ধমকে একেবারে আধবসা অবস্থায় উঠিয়া অন্ধের মৃতদেহটা আবার শুইয়া পড়িল।

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াই ডাক্তার নীরবে বাহির হইয়া গেলেন।

সকলে নীরব। প্রত্যেকের নিশ্বাসের শব্দ যেন শোনা যায়। অকস্মাৎ এই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দৈত্য হাউ হাউ করিয়া উঠিল। ঠিক যে কান্না তাহা নয়, এক প্রকার দুর্বোধ্য ভয়ের শব্দ, আতঙ্ক ভরা আর্তি।

পাড়ার কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন, হেরম্ব একজনকে নিম্নস্বরে বলিল, ও লোকটি মুসলমান, ঘর থেকে বের করে দিন।

বাহিরে যাওয়ার আদেশটা দৈত্য প্রথমে বুঝিতে পারিল না, বোঝা মাত্র তীরবেগে বাহির হইয়া গেল।

প্রভা দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, ভিতরে আসিয়া রাধার পাশে বসিয়া পড়িল। হেরম্বের বিধবা পিসীমাও আসিয়াছিলেন, রাধাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হাত দিয়ে ছুঁয়ে থাক বাছা, একজনের ছুঁয়ে থাকতে হয়।

কাসির শেষ ধাকায় রাধার কব্জি হইতে অধরের মুষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল। তাহার পায়ে হাত রাখিয়া চোখ তুলিয়া পিসীমার বিধবা বেশ দেখিয়া রাধা যেন অবাক্ হইয়া গেল।

আমি তো কিছুই জানি না, এখনি কি সিঁদুর মুছে শাঁখা খুলে ফেলতে হবে?

তাহার এই কথার কল্পনাতীত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সকলের সময় লাগিল। হেরম্ব বলিল, এখন নয়, ফেরার সময়, শ্মশানে।

শ্মশান কোথায় হেরম্ব বাবু? সহরের বাইরে? লোকালয় ছাড়িয়ে?

দু'জনের মধ্যে শুধু মৃতদেহের ব্যবধান। সামনে ঝুঁকিয়া সকলের আশ্রাব্য স্বরে রাধা আবার বলিল, এবার থেকে শ্মশানে বাস করব— জীবনের শেষ সীমায়। মানুষের মধ্যে বাস করার অধিকার আমার ঘুচল।

রাধার দাদা আসিয়াছিলেন, হেরম্বের দুইহাত চাপিয়া ধরিয়া কৃতজ্ঞতায় তিনি একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।

কি ব'লে আপনাকে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাইনা হেরম্ববাবু। দু'দিনের জন্য বাড়ী গিয়েছি, ফিরে দেখি রোগা স্বামীকে নিয়ে রাধা কোথায় যে গেছে কেউ বলতে পারে না। আপনার তার পাওয়া পর্য্যন্ত কি দুর্ভাবনাতেই যে দিন যাচ্ছিল।

হেরম্ব বলিল, আপনাকে খবর দেওয়ার মধ্যে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। আপনার বোন তার করতে বলেছিলেন।

অ! বলিয়া দাদার কৃতজ্ঞতার উচ্ছাস জুড়াইয়া গেল।

বিকালেই বিদায়ের আয়োজন। ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া গলির মুখে দাঁড়াইল। রাধার দাদা গাড়ীতে জিনিষ তুলিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

রাধা বলিল, এ বেশে ফিরতে হ'বে জানতাম, এ ভাবে ফিরব জানা ছিল না।

হেরম্ব নীরব হইয়া রহিল।

রাবণের অবস্থা হ'ল আমার। দ্বিধা করে' করে' স্বর্গের সিঁড়ি আর তৈরী হল না। আজ থেকে দশমাস সময় এখনো মানুষ আমায় দিয়েছে, মানুষ খুব বিবেচক, নয়?

এ আলোচনা হেরম্বের আজ সহ্য হইতেছিল না। প্রসঙ্গান্তরের প্রত্যাশায় জিজ্ঞাসা করিল, দৈত্যকে দেখতে পাচ্ছি না যে?

ওকে বিদায় করে' দিয়েছি।

কেন?

সন্দেহে। ওর বুদ্ধি খুবই কম, কিন্তু কেসে কেসে যে মরতে বসে চাইলেই তাকে তামাক দিতে নেই, এটুকু কি আর ও বোঝেনি! প্রথমটা মনে করেছিলাম বোকামী, শেষে সন্দেহ হ'ল শয়তানী হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।

শয়তানী! হেরম্ব চাহিয়া দেখিল উঠানে হুঁকো-কলিকাটা এখনও পড়িয়া আছে।